# মডেল

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

# সূচিপত্র

আচরণ ..... 2
আরোগ্য ..... 13
দিনবদল ..... 19
পথচিত্র ..... 36
বোরখা ..... 44
মা ..... 55



www.bengaliebook.com

# আচরণ

সুমিত্রা সিংহর বয়েস এখন আটচল্লিশ। কিন্তু মেয়েদের কাছে আটষট্টির মুখোস এঁটে থাকেন সর্বদা। শুধু মেয়েদের কাছে কেন, নানা বয়সের বিয়াল্লিশজন শিক্ষয়িত্রীও তার প্রায় মৌন অনুশাসনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘরে ডাক পড়লে তারাও খুব স্বস্তি বোধ করেন না।

চারশো মেয়ে, বিয়াল্লিশজন শিক্ষয়িত্রী, স্কুল বাস-এর জনাকয়েক ড্রাইভার আর ক্লিনার, চারজন ঝাড়ুদার, তিনটে মালী আর হস্টেলের মেট্রন আর কিছু ঝি-চাকর নিয়ে সুমিত্রা সিংহর সাম্রাজ্য। ছোট ব্যাপার কিছু নয়। সকলের সকল স্বার্থ বজায় রেখে নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গে একটা স্কুল চালানো বেশ ধকলের কাজ। আজ ছবছর ধরে শক্ত হাতে এই প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরে আছেন তিনি। স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্বিবাদে এখন তার সব সুপারিশ মেনে চলেন। সব থেকে উঁচু আসনটি তাঁর দখলে আসার পর থেকে বছরের পর বছর বোর্ডের পরীক্ষার রেজাল্ট দেখছেন তারা। শুধু এরই ফলে স্কুলে প্রতি বছর নতুন ভর্তির হিড়িক সামলানো দায়। কোন ক্লাসে সাতটা সীট খালি থাকলে তিনশো মেয়ে পরীক্ষা দিতে বসে যায়। এ ব্যাপারে হোমরা চোমরাদের সুপারিশ অচল। তাছাড়া সুমিত্রা সিংহ আসার পর গার্জেনদের অবুঝ দাপট কমেছে, শিক্ষয়িত্রীদের দলাদলি গেছে। হবিতম্বি করতে এসে অনেক গার্জেনকে মুখ বুজে মেয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হয়েছে। কয়েকজন অকেজো বা অবাধ্য টিচারকে অবসর নিয়ে যেতে হয়েছে। সর্বাধিনায়িকাটির সুনজরে পড়তে হলে ক্লাসের। মেয়েদের ভালর জন্যে প্রাণপাত করতে হবে–এ এখন সব শিক্ষয়িত্রীরাই বুঝে নিয়েছেন।

বেশি পরিশ্রম করতে হয় বলে সকলেই তুষ্ট নয়। এত দাপট দেখে ভিতরে ভিতরে কারো বা ঈর্ষা। তারা দেমাক দেখেন, দম্ভ দেখেন। রূপের দেমাক। রূপসী আদৌ নন, কিন্তু সুশ্রী বটেই। তাছাড়া স্বাস্থ্যের বাঁধুনি এমন যে আটচল্লিশ বছর বয়সটাকে অনায়াসে চল্লিশে টেনে নামানো যায়। আর এদের চোখে দম্ভ বলতে শিক্ষার দম্ভ। ইংরেজিতে কলকাতার এম, এ আর এম, এড। সুযোগ সুবিধে পেলে ওরকম বিলেতি ছাপ যে কেউ নিয়ে আসতে পারে। বেড়ালের ভাগ্যে ক্বচিৎ কখনও শিকে ঘেঁড়েও। স্কুলমাস্টারি

করতে করতে হঠাৎ সরকারী দাক্ষিণ্যের সুযোগে সুমিত্রা সিংহও তেমনি কিছুদিন বিলেতে ঘুরে এসেছেন। আড়ালে আবডালে এই সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের ব্যাপারেও কেউ কেউ জটিল সংশয়ের ছায়া ফেলতে ছাড়েন না। বয়েসকালের সুশ্রী মেয়ের সুপটু তোষামোদে কত কি হয়, কত কি হতে পারে। কিন্তু দেয়ালেরও কান আছে। একান্ত বিশ্বস্তজন ভিন্ন কারো মনের কথা মুখে ফোটে না।

সুমিত্রা সিংহ যেখান দিয়ে হাঁটেন চলেন, শিক্ষয়িত্রীরা ঠাণ্ডা, মেয়েরাও সন্ত্রস্ত। আর ঘরে ডাক পড়লে তো কথাই নেই, ভিতরে ভিতরে ঘাম হতে থাকে।

সুমিত্রা সিংহর বাড়ির চালচলনেও রকমফের নেই খুব। এখানেও একটা হালকা গাম্ভীর্য ছুঁয়ে আছে তাকে। এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে নতুন ডাক্তার, মেয়ে কলেজে পড়ে। ছেলে আর মেয়ে তাদের ডক্টরেট বাপের থেকে মাকে বেশি সমীহ করে। ডক্টরেট ভদ্রলোক ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে বই পড়েন আর থেকে থেকে স্ত্রীর গম্ভীর মুখের ওপর দুচোখের কৌতুক ছড়ান। সেটা কখনও-সখনও ধরা পড়ে না এমন নয়।

স্ত্রীটি তখন থমকে তাকান।

–কি?

কি?

হাসছ মনে হচ্ছে?

এটা সেটা বলে ভদ্রলোক সামলে নেন। য়ুনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের প্রফেসার তিনি। আপন মনে হাসার অনেক কারণ তার ঠোঁটের ডগায় মজুত। মহিলার তখনো প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সন্দিগ্ধ চোখ। এ নিয়ে এই সেদিন আরো একটু মজার ব্যাপার ঘটে গেছল। শনিবার বিকেল চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরেছিলেন। ডক্টর সিংহ অন্য দিনের মতোই বই হাতে ইজিচেয়ারে শয়ান। ভদ্রলোকের দুতিন ঘণ্টার বেশি ক্লাস থাকে না বলে স্ত্রী



www.bengaliebook.com

তার চাকরিটাকে ফাঁকিবাজী ছাড়া আর কিছু ভাবেন না! এক এক সময় খোঁটাও দেন–মাস্টাররা যে রকম পরিশ্রমকাতর ছেলেরা কত আর মানুষ হবে!

সুমিত্রা সিংহর মেজাজ খুব প্রসন্ন ছিল না সেদিন। স্কুলের কোন একটা ভাবনা মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে সেই চিন্তা করেছেন, মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে ঘরে আর সামনের বারান্দায় পায়চারি করেছেন।

হঠাৎই এক সময় খেয়াল হল বই কোলের ওপর ফেলে স্বামীটি সকৌতুকে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। ভুরুর ভাজ আরো একটু ঘন হল–হাসছ যে?

ভদ্রলোক সেদিন সত্যি কথাই বললেন। জবাব দিলেন, তোমাকে দেখে।

আমাকে দেখে হাসছ মানে?

বাজারে সাদা কলপ কিনতে পাওয়া যায় কিনা দেখো, তোমার এই চালচলন মানাচ্ছে না।

তার মানে?

কাছে এস, বলছি।

সত্যিই এখন শুধু সমস্যার জগৎ আর চিন্তার জগতে বাস মিসেস সুমিত্রা সিংহর। সঠিক না বুঝে কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাত ধরে আচমকা আরো কাছে টেনে যে কাণ্ডটা করে বসলেন ভদ্রলোক দিশেহারার মত ছিটকে সরে দাঁড়ালেন মহিলা। আরক্ত মুখে আর অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে রইলেন খানিক। ভদ্রলোক কৈফিয়ৎ দিলেন, সেজন্যেই তো সাদা কলপের কথা বলছিলাম, তোমাকে দেখলে আমার এখনো এই সাধ জাগে তো কি করব।

সুমিত্রা সিংহ এরপর পনেরো মিনিট ধরে শাসালেন তাঁকে। শোওয়ার ঘর আলাদা করে দেবার হুমকি দিলেন, বয়েস কালের ধর্ম আর শৃঙ্খলা মেনে



www.bengaliebook.com

চলার কথা বললেন, দরজা কপাট হাঁ করা খোলা, ছেলেমেয়েরা একজন কেউ দেখে ফেললে কি কাণ্ড হত সে কথা পাঁচবার করে শোনালেন।

ভদ্রলোক বেচারা দোষ স্বীকার করে বললেন, দরজ, কপাট বন্ধ না করে এ রকম গর্হিত কাজ আর কখনো করবেন না।

ভদ্রমহিলা দ্বিগুণ আগুন হয়ে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন। এরপর কটা দিন মায়ের মেজাজ দেখে ছেলে মেয়ে অবাক। বাবার সামনেই কথায় কথায় আত্মসংযম সম্পর্কে ধারালো উপদেশ শুনতে হয়েছে তাদের।

সুমিত্রা সিংহ স্কুলে নিজের ঘরে বসে আছেন। কঠিন থমথমে মুখ। অসংযম আর শৃঙ্খলাভঙ্গের এক দারুণ নালিশ এসেছে তার কাছে। অপরাধী একেবারে উঁচু ক্লাসের পাঁচটি মেয়ে। স্কুল হস্টেলে থাকে তারা। নিজের স্কুলে এত বড় অপরাধের কথা তিনি ভাবতে পারেন না। কিন্তু অবিশ্বাস করার কিছু নেই। অপরাধের নজির তার সামনে। স্কুল লাইব্রেরির কতগুলো ঘেঁড়া-খোঁড়া বই। অসংযত ঘূর্তির উল্লাসে ওই মেয়েগুলো ছিঁড়েছে। বইয়ের নানা জায়গায় অশ্লীল মন্তব্য লেখা। সেও ওই মেয়েগুলোর কাজ। এ ছাড়া তাদের কতগুলো নোঙরা চিঠিচাপাটি হাতে নাতে ধরা পড়েছে। রেসিডেন্সিয়াল টিচার আর মেট্রন সেগুলোও হেডমিসট্রেসের কাছে দাখিল করেছেন।

সব দেখে শুনে সুমিত্রা সিংহর নিজেরই আত্মস্থ হতে সময় লেগেছে। তারপর ঠাণ্ডা মুখে ওই পাঁচ মেয়ের সম্পর্কে রিপোর্ট নিয়েছেন তিনি। পাঁচটি মেয়ের মধ্যে চারজন স্কুলের পুরনো ছাত্রী এবং মোটামুটি ভাল ছাত্রী। কেবল একটি মেয়ে নতুন। নাম নন্দিতা বসু। গেল বছর অন্য স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কোনরকম ধর-পাকড়ের জোরে নয়, পঞ্চাশ ষাটজন বাইরের মেয়ের মধ্যে এখানকার অ্যাডমিশন টেস্টে সমস্ত পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে ভর্তি হয়েছিল। তারপর গেলবারের অ্যানুয়াল পরীক্ষায়ও ওই মেয়ে সমস্ত বিষয়ে ফার্স্ট হয়ে ক্লাস প্রমোশন পেয়েছে। কিন্তু পড়াশুনায় যত ভালই হোক ওই মেয়েই সমস্ত নষ্টের গোড়া। এসব অপকর্ম বেশীরভাগই তার। কাউকে পরোয়া করে না। ওই

একটা মেয়েই বাকি চারটে মেয়েকে এভাবে নষ্ট করছে। ধরা পড়ার পর এই মেয়েরা ঘাবড়ে গিয়ে রেসিডেন্সিয়াল টিচারের কাছে সব কবুল করেছে। মেট্রন আরো জানালেন ধরা পড়ার পরেও ওই নন্দিতা বসুরই কেবল বেপরোয়া হাবভাব।

অভাবনীয় একটা শাস্তির নজির রাখার সংকল্প নিয়েছেন সুমিত্রা সিংহ। তার নামেই সমস্ত মেয়ের রক্ত জল, কোনদিন কোন মেয়ের গায়ে হাত তোলার দরকার হয়নি। কিন্তু এ ঘটনা সব কিছুর ব্যতিক্রম। তিনটে বেত আনিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। তার নির্দেশমত রেসিডেন্সিয়াল টিচার আর মেট্রন ওই পাঁচ মেয়েকে ডেকে নিয়ে আসতে গেলেন।

শাস্তি কি দেবেন সুমিত্রা সিংহ সেটা স্থির করে ফেলেছেন। নতুন মেয়ে নন্দিতা বসু যত ভাল ছাত্রীই হোক এতখানি অধঃপতনের পর তাকে আর স্কুলে রাখবেন না। তাই তার গায়ে হাত তোলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাকে সেটা বুঝতে দেবেন না। তার সামনে চার মেয়েকে শাস্তি দেবার পর ব্যাড কন্ডাক্ট-এর ছাপ মেরে তাকে স্কুল থেকে তাড়াবেন।

পাঁচ মেয়েই এল। পিছনে রেসিডেন্সিয়াল টিচার আর মেট্রন। পুরনো চার মেয়ের বিবর্ণ পাংশু মুখ। এমনিতেই থর থর কাঁপছিল, প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মূর্তি দেখে আর টেবিলের ওপর বেত দেখে তাদের আরো হয়ে গেছে। চারজনই হাত জোড় করে নিঃশব্দে ক্ষমা চাইছে।

ক্ষমাশূন্য চোখে একে একে সবকটি মেয়েকে দেখলেন সুমিত্রা সিংহ। সব শেষে নন্দিতা বসুকে। মেয়েটার তখনো উগ্র হিংস্র চাউনি। নতুন বয়সের খাঁচায় পোরা এক উদ্ধত জীব যেন। সংকল্প ভুলে সকলকে ছেড়ে ওকেই মাটিতে শুইয়ে ফেলার জন্যে হাত নিশপিশ করে উঠল সুমিত্রা সিংহর। কিন্তু নিজে তিনি সংযম খুইয়ে বসতে পারেন না।

ওই নন্দিতা বসু মেয়েটার দিকে কয়েক পলক চেয়ে থাকার পরই নিজের ভিতরে কেমন যেন একটা নাড়া-চাড়া পড়ল সুমিত্রা সিংহর। এই মেয়ের মুখে কার যেন চেনা আদল একটা। ঠিক মনে করে উঠতে পারছেন না, কিন্তু এই মুখে কার একখানা মুখ যেন হুবহু বসানো!

কয়েক নিমেষের অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে সুমিত্রা সিংহ কর্তব্যে মন দিলেন। বেতের আঘাতে আঘাতে এক একটা মেয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল আর তার পা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তখনো নির্মম কঠিন তিনি। শাস্তির পর একটি করে মেয়েকে বিদায় দিয়ে পরেরটিকে ধরেন। ঘরের মধ্যে শুধুই একটা ত্রাসের হাওয়া বইছে।

কিন্তু একটা করে মেয়ের ওই আর্তনাদের মুখেই এক একবার নন্দিতা বসুর দিকে চোখ গেছে তার। উদ্ধত আক্রোশে মেয়েটা যেন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে মেট্রন দাঁড়িয়ে, বাইরে দরোয়ান। এক একটা মেয়ের শাস্তি শেষ হলে তবে দরজা খুলে তাকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। তখনো সুমিত্রা সিংহর মনে হয়েছে রাগ হলে কার একখানা মুখের চিবুক আর ঠোঁট ওই মেয়েটার মতই বেঁকে যেতে দেখেছেন কবে। আবারও মনে হয়েছে মেয়েটার অমন সুশ্রী মুখের সঙ্গে কার যেন আশ্চর্যরকম মিল।

চার নম্বর পুরনো মেয়েও বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সুমিত্রা সিংহ হাঁপাচ্ছেন বেশ। দুচোখ জ্বলছে। নিজের চেয়ারে বসে সোজা একবার তাকালেন নন্দিতা বসুর দিকে। সব থেকে বেশি দাগী মেয়েটা এখন বেপরোয়া উদ্ধত চোখেই চেয়ে আছে তার দিকে।

সুমিত্রা সিংহ ইশারায় রেসিডেন্সিয়াল টিচার আর মেট্রনকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেই প্রস্থান করল। এই মেয়ের শাস্তিটাই বিশেষ করে চোখে দেখার ইচ্ছে ছিল বোধহয়।

ঘরের মধ্যে দুজনে মুখোমুখি এবার। চোখাচোখি।

অনুচ্চ কঠিন গলায় সুমিত্রা সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম নন্দিতা বসু?



www.bengaliebook.com

হ্যাঁ। আপনি আমার গায়ে হাত তুলবেন না, ইচ্ছে হলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

মুহূর্তের জন্যে সংযম হারালেন সুমিত্রা সিংহ। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে বেতটা তুলে নিয়ে মেয়েটার কাধ বেড়িয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত করে বসলেন। কিন্তু ওই একটাই। সুশ্রী মেয়েটার রক্তবর্ণ মুখ এখন। চেয়ে আছে। প্রহারের জবাবটা যেন চোখ দিয়ে দিচ্ছে। সুমিত্রা সিংহ বুঝে নিলেন আঘাতে আঘাতে মাটিতে শুইয়ে ফেললেও এ মেয়ের মুখ দিয়ে কান্নার শব্দ বেরুবে না।

তার দরকারও নেই। সংকল্প মতই কাজ করবেন। কিন্তু মেয়েটার এই মুখের আদল কেন যেন বড় বেশি বিমনা করে তুলছে তাকে।

বসলেন আবার। তেমনি কঠিন গলায় ফের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মায়ের নাম কি?

সুজাতা বোস।

না, সুমিত্রা সিংহ এই নামের কাউকে চিনলেন না।

বাবার নাম কি?

নীতিশ বোস।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের তলায় কি রকম একটা তোলপাড় কাণ্ড হয়ে। গেল সুমিত্রা সিংহর। একটা অস্পষ্টতার পর্দা সরে গেল চোখের সামনে থেকে। হ্যাঁ, অবিকল সেই নাক মুখ চোখই বটে। ঠোঁট বাঁকানোটা পর্যন্ত সেই রকম। জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না, তবু প্রশ্নটা যেন আপনা থেকেই গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।–কি করেন?

বার অ্যাট ল। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন।



www.bengaliebook.com

না, কোথাও ভুল নেই, বিয়ের পর নীতিশ বোসের ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যেই বিদেশ যাওয়া স্থির ছিল।

দীর্ঘকালের শিক্ষয়িত্রী জীবনে এ রকম আর কখনো হয়নি। মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে চেষ্টা করেও নিজেকে আর অত কঠিন করে তুলতে পারছেন না। সুমিত্রা সিংহ। জিজ্ঞাসা করলেন, কলকাতাতেই বাড়ি, তবু তুমি বাবা মায়ের সঙ্গে থাক না কেন?

মেয়েটা সাদাসাপটা জবাব দিল, মা বাবার সঙ্গে থাকেন না, ডিভোর্স হয়ে গেছে। বাবা তাই আমাকে হস্টেলে রেখেছেন।

সব ভুলে সুমিত্রা সিংহ বিমূঢ় মুখে মেয়েটার দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। মেয়েটা পড়াশুনায় এত ভাল, তা সত্ত্বেও এ রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কারণ যেন বুঝতে পারছেন তিনি। মেয়েটার কথা-বার্তায় আচরণে একটা চাপা ক্ষোভ স্পষ্ট।

তোমার বাবার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হতে পারে?

মেয়েটা টেলিফোন নম্বর বলে দিল।

কখন ফ্রী থাকেন তিনি?

সন্ধ্যার পর। সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন।

আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।

উদ্ধত মখেই মেয়েটা চলে গেল। সে কেমন করে যেন ধরে নিয়েছে অন্য কটা মেয়ের থেকে তার শাস্তি কঠিন হবে। অর্থাৎ বাবাকে বলে স্কুল থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে তাকে।

প্রায় আধঘণ্টা স্থাণুর মত চুপচাপ বসে রইলেন সুমিত্রা সিংহ। সাড়ে নটায় স্কুল, এখন সকাল সাড়ে দশটা। কি ভেবে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে নম্বর ডায়াল করলেন।



www.bengaliebook.com

পেলেন।

বোস হিয়ার।

আমি আপনার মেয়ের স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস মিসেস সিংহ।... আপনার মেয়ে নন্দিতার গ্রোস মিস কর্ডাক্টের সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার। তাকে আর এ স্কুলে রাখতে পারা শক্ত।

ওদিকের ভারী গলার স্বর থমকালো একটু।–কি মিস কনডাক্ট?

সেটা টেলিফোনে বলা সম্ভব নয়।

আই সি...বাট আই অ্যাম অফুলি বিজই...একমাত্র সন্ধ্যার পর বাড়িতে দেখা হতে পারে, বাট দ্যাট উইল বি পারহ্যাপস্ টু মাচ টু আস্‌ক

এদিক থেকে আরক্ত মুখে সুমিত্রা সিংহ বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর এবং জরুরী–আপনার আসা দরকার।

বাট ইউ সি, আই কান্ট পসিবলি মেক এই টাইম। ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর। ইউ ডু ওয়ান থিং ম্যাডাম, কাইন্ডলি সেণ্ড এভরিথিং ইন রাইটিং, আই উইল সি টু ইট। থ্যাঙ্ক ইউ।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ।

অসহিষ্ণু মুখে সুমিত্রা সিংহ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিলেন খানিক। এরপর সোজাসুজি ওই মেয়ের বিরুদ্ধে চরম ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেবার কথা তার। তিনি সদয় হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোকটার এত সাহস আর এত দম্ভ যে ঘুরিয়ে বাড়িতে দেখা করার কথা বলল। কিন্তু আশ্চর্য, এর পরেও তিনি যা করণীয় করে উঠতে পারলেন না। মেয়েটার প্রতি তার মায়া বাড়তেই থাকল। তার ধারণা, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিয়ে বিকৃত পথে চলেছে এমন ভাল মেয়েটা ৮ হ্যাঁ, এখনো তার উদার হবার ইচ্ছে। উদার হতে পারলে কোথায় যেন একটু শান্তিও। ...প্রায় পঁচিশ বছর আগের একখানা



www.bengaliebook.com

মুখ চোখে ভাসছে তাঁর। ওই সুশ্রী মেয়েটার সঙ্গে মুখের আদল হুবহু মেলে যাঁর সঙ্গে তার। নীতিশ বোসের।

সুমিত্রার বয়েস তখন তেইশ। তখন সিংহ হননি। ঘোষ, সবে এম-এ পাশ করেছেন। এবারে নীতিশ বোসের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাবার কথা। বাপে-বাপে বন্ধুত্ব। অনেক দিন আগে থেকেই কথা পাকা। বোসেরা বনেদী বড়লোক। সুমিত্রার বাবা-মা নিশ্চিন্ত। বিয়ের পরেই ছেলে বিলেত চলে যাবেন ব্যারিস্টারি পড়তে অতএব তার পক্ষে ঘন ঘন এ বাড়িতে আসার লোভটা স্বাভাবিক। নীতিশ বোস সপ্তাহে কম করে চার পাঁচদিন আসতেন আর সে রকম ফাঁক পেলে ভাবী স্ত্রীর ওপর একটু আধটু মিষ্টি হামলাও করে বসতেন। সুমিত্রাকে নিয়ে বেরুনোর তাগিদ দিতেন। কিন্তু সুমিত্রার দিক থেকে তেমন সাড়া পেতেন না বলে কখনো রাগ হত কখনো বা অভিমান।

সুমিত্রার জীবনে যথার্থই সংকটের কাল সেটা। রাশভারী বাবাকে কিছু বলা যাচ্ছে না। বলা যাচ্ছে না, কারণ ওখানে বিয়ে অনেক দিন ধরেই ঠিক। অথচ তিন বছর হল পিছনের বাড়ির এক ছেলের কাছে মন সঁপে বসে আছেন তিনি। গরীব ঘরের ছেলে। স্কলারশিপ পেয়ে নিজের পড়াশুনা চালাচ্ছেন। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সেই ছেলেও সুমিত্রার আশ্বাস পেয়ে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। বড়লোকের হবু ব্যারিস্টার ছেলের মনের মত অনেক মেয়ে জুটবে, কিন্তু কথার খেলাপ করলে এই ছেলের বুক ভেঙেই যাবে একেবারে।

সেই সংকটের ফলে জীবনে একটাই মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে। মাকে স্পষ্ট করে বলেছেন, বাবাকে জানিয়ে দাও এ বিয়েতে আমার আপত্তি আছে।

মা আকাশ থেকে পড়েছিলেন একেবারে।সে কি রে! কেন?

কেন আবার কি! সুমিত্রা মরিয়া একেবারে।–বড়লোকের ছেলে, এখনই মদের নেশা, পরে আরো কত গুণ দেখা যাবে কে জানে। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমার আপত্তি আছে।



www.bengaliebook.com

ওই একটা জিনিস বাবা আন্তরিক ঘৃণা করেন সুমিত্রার সেটা খুব ভাল জানা ছিল। এই এক কারণে বাবার সঙ্গে কাকার মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অতএব আর কোন উপায় না দেখে সুমিত্রা এই পথ ধরেই সংকট কাটিয়ে উঠতে চেয়েছেন। হবু ব্যারিস্টারের বাড়িতে এ কথা তো কোনদিন প্রকাশ হবে না, তাদের আর এমন কি ক্ষতি। বিয়েটা নাকচ হবে শুধু।

নাকচ হয়েছে। সুমিত্রার ধারণা বাবা শুধু তাদের জানিয়ে দিয়েছেন মেয়ের আপত্তির কারণে এ বিয়ে হল না। এ ছাড়া আর বলার কি আছে?

তারপর কথা যাঁকে দেওয়া হয়েছে সময়ে তাকেই বিয়ে করেছেন তিনি। সুমিত্রা সিংহ হয়েছেন।

নিজের ভিতরে কোন সুপ্ত অপরাধবোধ ছিল কিনা সুমিত্রা সিংহ জানেন না। নইলে পঁচিশ বছর বাদে এক মেয়ের মুখের আদল দেখে অবচেতন মনে হঠাৎ ওই রকম নাড়া পড়েছিল কেন!

না, স্কুল থেকে তাড়িয়ে ওই সুশ্রী মেয়েটাকে জাহান্নমের পথে ঠেলে দেবেন না সুমিত্রা সিংহ। বরং এই মানসিক আবর্ত থেকে ওকে টেনে তুলতে পারাটাই যেন ভাল কাজ হবে, উদারতার কাজ হবে।

স্কুলের একজন ড্রাইভারকে বলে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার পর সে তাকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় নিয়ে এল।

সুমিত্রা সিংহ কার্ড পাঠালেন।

কিন্তু তারপরেও কম করে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হল। ভাবলেন, কোন। কেস নিয়ে ব্যস্ত বোধহয়।

কিন্তু নীতিশ বোস ঘরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙল। আঁ করে একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। লোকটার থঙ্কলে লালচে মুখ। টানা দু চোখ ঈষৎ আরক্ত। নেশার মধ্যপথে উঠে আসতে হয়েছে বলেই হয়তো ভুরুর মাঝে ভাজ।–সীট ডাউন প্লীজ।

সুমিত্রা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বসলেন আবার। ভিতরটা মুহূর্তের মধ্যে বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেছে। আশ্চর্য, সেই সঙ্গে স্বস্তিবোধও। কোন এক দিনের মিথ্যাচারের সুপ্ত অপরাধটুকু আজ অন্তত ধুয়ে মুছে গেছে।

নীতিশ বোসের এবারে হঠাৎ খেয়াল হল সামনে কাকে দেখছেন। পঁচিশ বছরের ফারাকেও সুমিত্রার চেহারা খুব বদলায় নি। বিশ্বাস করবেন কি করবেন না ভেবে পাচ্ছেন না। চোখ টান করে দেখছেন। হাতের কার্ডটা একবার চোখের সামনে ধরলেন। তারপর ভারী গলায় টেনে টেনে বললেন, তুমি সুমিত্রা সিংহ...ওই স্কুলের হেডমিসট্রেস।

ঈষৎ রূঢ় গলায় সুমিত্রা বাধা দিলেন, আপনি করে বলুন। আপনার মেয়ের কনডাক্ট সম্পর্কে একটু সীরিয়াস আলোচনার দরকার ছিল, কিন্তু আপনার পক্ষে এখন সেটা সম্ভব নয় মনে হচ্ছে।

মেয়েকে ওই স্কুলে রাখতে হলে স্কুল টাইমে গিয়ে দেখা করার কথা বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হল না। নীতিশ বোসের নেশা-ছোঁয়া দুচোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে টানা ভারী গলাও শোনা গেল।-ওয়েট! আই ডোন্ট থিংক দ্যাট উইল বি নেসেসারি। আলোচনার দরকার নেই। দু আঙুলে সুমিত্রা সিংহর নাম লেখা কার্ডটা তুলে সামনে ধরলেন।–এই মহিলা যে স্কুলের প্রধান সেখানে আমার মেয়েকে রাখা আমি উচিত মনে করি না। আই উইল সেণ্ড হার ডিউস টুমরো মর্নিং অ্যাণ্ড গেট হার টি. সি. গুড নাইট!

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তারপর সৌখিন পার্টিশনের ওধারে চলে গেলেন।

স্কুল বাসে বাড়ি ফিরছেন সুমিত্রা সিংহ। দুর্বার রাগে নিশ্চল স্তব্ধ তিনি। এত বড় স্পর্ধার কথা জীবনে কেউ শোনায়নি তাকে।...কিন্তু বুকের ভিতরে কোথায় চিনচিন করে জ্বলছে।

## আরোগ্য

ব্যবস্থা দেখে রাধারাণী খুশী।



www.bengaliebook.com

জীবন এখানে যত্নের জিনিস, লালনের সামগ্রী। পায়ে পায়ে ক্ষয়ের খোড়ল হাঁ করে নেই। এখানে শুধু জীবনের মূল্যবোধটুকুই স্পষ্ট। চারদিক শুচিশুভ্র আরাম দিয়ে ঘেরা। বেশ ঠাণ্ডা নিরাপদ আরাম।

ঘরের দুই কোণে দুটো তকতকে বেড। এর অর্ধেকেরও অনেক ছোট ঘরে চারজনে থেকে অভ্যস্ত তারা, ওইটুকুর মধ্যেই একটা গোটা সংসার। বিবাহিত জীবনের বাইশ বছরের মধ্যে এই প্রথম যেন নতুন বাতাসের স্বাদ পেলেন রাধারাণী। বাঁচার আগ্রহ বোধ করতে লাগলেন, মনের তলায় এক ধরনের উৎসাহ উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

দিনে ছ টাকা চার্জ। তাও ভূতনাথবাবু ওপর-ওলাদের ধরে পড়ে অর্ধেক দক্ষিণায় রাজী করাতে পেরেছেন বলে। নইলে চার্জ বারো টাকা। কিন্তু দিনে ছ টাকাই রাধারাণীর কাছে আঁতকে ওঠার মত–মাসে একশ আশী টাকা। তার ওপর ওষুধ-পত্র ফল টলে মাসে কম করে আরো পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা–হল দুশ তিরিশ! শুনেই রাধারাণী বিগড়ে গিয়েছিলেন। কমাস থাকতে হবে কে জানে...। কিন্তু তিনি নিশ্চিত নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছেন দেখেই মুখ কালো করে ভূতনাথবাবু সরাসরি তাকে এখানে এনে ফেলেছেন। রাধারাণী সাহস করে আর আপত্তি করতে পারেন নি। মুখ খুললেই কুরুক্ষেত্র বাধবে জানেন, তখন আর ভদ্রলোক রোগিণী বলে রেহাই দেবেন না ওঁকে। ছেলেমেয়ের সামনেও এমন কথা বলে বসেন যে চামড়ার নিচে হাড়-পাঁজরসুদ্ধ খটখটিয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে জীবন-রক্ষার উপকরণ দেখে রাধারাণীর মনে হল তাদের নেই-নইলে, এর তুলনায় দিনে ছ টাকা ছেড়ে বারো টাকাও কিছু নয়।

ও পাশের বেডে যে মেয়েটি থাকে তার বছর তিরিশ বয়েস। কিন্তু এরই মধ্যে কঠিন রোগ বাধিয়ে বসেছে। পেটে জল হয়েছে নাকি। দেখতে বেশ সুশ্রী। কিন্তু বড় বেশি রকম অবুঝপনা আর বায়নাক্কা। রোজ চারটে বাজতে না বাজতে মেয়েটির স্বামী দেখতে আসে ওকে-কালো মোটাসোটা, বছর চল্লিশ হবে বয়েস। সচ্ছল অবস্থা বোঝা যায়। রাধারাণী শুনেছেন কাগজের কারবার তাদের। লোকটি রোজই কিছু না কিছু হাতে করে নিয়ে আসে।

দুর্মুল্যের ফল, দামী দামী টনিক ফুড, গল্পের বই, শখের ব্লাউস, রুমাল, এমনকি গয়নাও। রাধারাণী দূর থেকে লক্ষ্য করেন, কিছুতে যেন মন ওঠে না মেয়েটার–কোনো কিছুতেই তুষ্ট নয়। লোকটি ঘড়ি ধরে পুরো দুঘণ্টই বসে থাকে তার শয্যার পাশে, স্ত্রীর সব কথাতেই সায় দেয়, সব আক্ষেপে সান্ত্বনা দেয়। দু-তিনদিন অন্তর বছর আটেকের একটি ছেলেও আসে বাপের সঙ্গে মাকে দেখতে। রাধারাণী শুনেছেন, ওই একটিই ছেলে ওদের, পুরনো ঝিয়ের জিম্মায় থাকে, বাড়িতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

রাধারাণী অবাক হয়ে ভাবেন, ছেলেটা রোজ আসে না কেন, আর ওই মা-ই বা ছেলেকে রোজ না দেখে থাকে কি করে! ওদিকে স্বামীটির আসতে আধ মিনিট দেরি হলে আধঘণ্টা তার জের চলতে দেখেছেন রাধারাণী। অনেক অনুনয় অজুহাত সাধ্য-সাধনায়ও সহজে মন গলে না। রাধারাণীর এক একসময় রাগই হয় মেয়েটার ওপর, অত পায় বলেই পাওয়ার ওপর এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। হত তার ঘরের লোকটির মত, এক দাবড়ানিতে সব ঠাণ্ডা।

যাই হোক, এখানকার এত সব সুব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়েও রাধারাণীর মনের তলায় কোথায় যেন যাতনার মত একটু। দু-বেলা খাবার সময় মন বেশ খারাপ হয়। দীর্ঘকালের রক্তাল্পতার রোগী তিনি, হাসপাতালের নির্দেশ অনুযায়ী আহারের রাজসিক ব্যবস্থা। মাছ-মাংসর ছড়াছড়ি। রাধারাণী অর্ধেকও খেয়ে উঠতে পারেন না। এমনি একটুকরো মাছ বাড়িসুদ্ধ লোকের একবেলার বরাদ্দ। এখন খরচের ধাক্কায় তাও জুটছে না নিশ্চয়। মেয়েটা কলেজের আগে ছেলেটাকে সময়মত দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পারে কিনা তাই সন্দেহ। তার ওপর উঠতে বসতে বাপের বকুনি তো আছেই-বকুনির চোটেই এখন সারা হল বোধ হয় দুটোতে।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের বেডের মেয়েটির কথা মনে হয়, আর তার স্বামীর কথা। অবশ্য সাত তাড়ার মধ্যেও ভূতনাথবাবু প্রায় রোজই একবার করে দেখে যান তাকে। দরকারী ওষুধ-পত্র সবই কিনে দেন, তারও মিটসেফে ফলমূল, থাকে কিছু। কিন্তু সে-সবই কিসের বিনিময়ে আসছে সেটা রুক্ষ মূর্তিটির দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়। ভিতরে ভিতরে গুমরে ওঠেন

রাধারাণী, এতবড় অসুস্থতার চিন্তাটাও মানুষটার সব থেকে বড় চিন্তা নয় যেন, এখানে এসেও দু-দণ্ড হাসিমুখে কথা বলার নাম নেই। ফলে মেজাজ সব দিন রাধারাণীরও ঠিক থাকে না, এক কথায় তিন কথা শুনিয়ে দেন। বিশেষ করে ওই বেডের মেয়েটির স্বামীটিকে দেখে দেখে তার সহিষ্ণুতা কমেছে অন্যের ঘরে কি, আর তার ঘরেই বা কি...।

সেদিন ভূতনাথবাবু আসতে ইঙ্গিতে রাধারাণী ওই মেয়েটিকে দেখিয়ে কথায় কথা বললেন, কাল সরস্বতীপূজো উপলক্ষে ওর স্বামী ওকে চমৎকার একজোড়া ফরাসডাঙর শাড়ি এনে দিয়েছে–আমাকে আবার ডেকে দেখাল।...ভদ্রলোক কত তোয়াজে রেখেছে মেয়েটাকে, রাধারাণী সেই গল্পও করলেন।

ভূতনাথবাবু হঠাৎ রুক্ষ বিরক্তিতে বলে উঠলেন, আমার তো সাধ্য নেই তোমাকে এখন ফরাসডাঙার শাড়ি এনে দিই–এইতেই তো শেষ হয়ে গেলাম।

শুনে রাধারাণী গুম হয়ে বসে রইলেন। তিনি শাড়ি চাননি। ওই রকম মন চেয়েছিলেন। ওই রকম অনুরাগটুকুই লোভনীয় ছিল।

এক মাসের মাথায়, এই ঘরে একটি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটল।

ওই মেয়েটার স্বামী দুঘণ্টার জায়গায় চার-ঘণ্টা ছ-ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে লাগল। শেষ অবস্থা বলেই অনুমতি মিলেছে বোধ হয়।

সেদিন দুপুর থেকেই অক্সিজেন চলছে।

রাধারাণীর বুকের ভিতরটা সারাক্ষণ কাঁপছে থরথর করে। ওই মেয়েটার ভাগ্যর ওপর চোখ দিয়েছিলেন বলে ভিতরে ভিতরে অপরিসীম যাতনা একটা। দুপুরে খুব কেঁদেছেনও, আর প্রার্থনা করেছেন, ঠাকুর ওকে বাঁচিয়ে দিও!

সন্ধ্যে থেকে তার স্বামী নিজেই অক্সিজেন ধরে বসে আছে। শান্ত বিষণ্ন মূর্তি। রাধারাণীর সেদিকে তাকাতেও কষ্ট।...একসময় দেখলেন, লোকটি

অক্সিজেনের নল রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। চুপচাপ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বুকের কাছে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল।

রাধারাণী চমকে উঠলেন। বুকের ওপর ভেঙে পড়বে নাকি এখনো যে শেষ হয় নি। অবশ্য শেষ হতে বাকিও নেই...কিন্তু লোকটা করছে কি!

রাধারাণী হঠাৎ নিস্পন্দ কাঠ একেবারে।

লোকটি মেয়েটির গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি, বালা, আঙটি, সব একে একে খুলে পকেটে ফেলল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। ডাক্তার মাথা নেড়ে চলে গেলেন। রাধারাণীর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত তখনো। চেয়ে আছেন বিস্ফারিত নেত্রে। দেখছেন।

...লোকটি শান্ত মুখে একটা ঝোলার মধ্যে স্ত্রীর শাড়ি কটা নিল, মিটসেফ খুলে নিজের আনা বোতলের খাবার আর টনিকগুলো দেখে দেখে পুরল, তারপর ভালো করে স্ত্রীকে আর একবার দেখে নিয়ে শ্রান্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাধারাণী চিত্রার্পিত।

ছেলে এবং লোকজন নিয়ে লোকটি ফিরল প্রায় ঘন্টা দুই বাদে। বারান্দায় খাঁটিয়া পাতা-ওখান থেকেই শ্মশান-যাত্রা।

.

এই একমাসে শরীরের আশাতিরিক্ত উন্নতি হয়েছিল রাধারাণীর। কিন্তু এর পরের তিনদিনের মধ্যেই অনেকটা খারাপ হয়ে গেল। রাতে ঘুম নেই, চোখ বসা, আহারে রুচি নেই, হজমে গোলমাল। দিনরাত গুম হয়ে ভাবেন কি যেন! ছেলে আসে, মেয়ে আসে, ভূতনাথবাবু আসেন–রাধারাণী ভালো করে কথাও বলেন না কারো সঙ্গেই। সকলেই চিন্তিত।



www.bengaliebook.com

সেদিন সকালে ছেলে একটা ওষুধ দিয়ে যেতে এসেছিল। রাধারাণী তার হাতে খুব যত্ন করে বাঁধা একটা পুঁটলি দিয়ে বললেন সাবধানে নিয়ে দিদির হাতে দিবি, ওনার বড় ট্রাঙ্কের একেবারে তলায় রেখে দেয় যেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হতভম্ব মুখে মেয়ে এসে হাজির। এক নজরে দেখে নিল মায়ের হাতে শুধু দুগাছা শাঁখা আর একটা লোহা।

–ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন মা?

রাধারাণী নিস্পৃহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন–তুলে রেখেছিস?

-না, চাবি তো বাবার কাছে, বাবা বাড়ি নেই, তুমি

–বাড়ি নেই তো তুই ওগুলো কার কাছে রেখে এলি? ভয়ানক রেগে গেলেন রাধারাণী, কে তোকে এখানে আসতে বলেছে এখন?

–কিন্তু তুমি হঠাৎ ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন?

–পাঠিয়েছি, আমি মরলে ওগুলো তোদের কাজে লাগবে বলে, সবেতে তোর বাড়াবাড়ি–যা শীগগির!...খানিক বাদে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, শরীরের যা অবস্থা, এখানে এ-সব পরে থাকা ঠিক নয়–শেষে হয়ত এটুকুও যাবে তোদের।

মেয়ে কাদ কাদ মুখে উঠে চলে গেল।

রাধারাণীর গত তিনদিনের জ্বালা একটু জুড়োল যেন। টাকাওয়ালা লোকেরই স্ত্রীর প্রতি যে দরদ দেখেছেন...নিজেদের তো প্রতি পয়সার হিসেব! তার অন্তিম শয্যায় কেউ তার গায়ের গয়নার কথা ভাবছে সে-দৃশ্য কল্পনা করেও রাধারাণী বারবার শিউরে উঠেছেন।

.

সেই পুটলি হাতে মেয়ে কাঁদ কাঁদ মুখ করেই বিকেলে ফিরল আবার। রাধারাণী সমাচার শুনলেন।...ছেলে বাপের হাতে পুঁটলিটা দিয়েছিল, আর

মেয়েকে বলতে হয়েছিল মায়ের অবুঝপনার কথা। শুনে উনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলেন খানিকক্ষণ, তারপর আচমকা এক চড়ে ছেলের গালে পাঁচটা আঙুলই বসিয়ে দিয়েছেন, গয়নাগুলো ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিয়েছেন, তারপর না খেয়ে অফিসে চলে গেছেন।

প্রত্যেকটা খবরই রেগে ওঠার মত। রাধারাণী রাগতে চেষ্টাও করলেন। কিন্তু রাগটা তেমন হল না।

সেদিন আর ভূতনাথবাবু তাকে দেখতে এলেন না। তার পরদিনও না।

তার পরদিন এলেন।

গয়না কটা রাধারাণী আবার পরেছেন। একখানা মোটামুটি ভালো শাড়িও পরেছেন। একটু বোধ হয় প্রসাধনও করেছেন। শয্যায় বসেছিলেন, বললেন, বোসো

ভূতনাথবাবু টুলটা টেনে বসলেন। তারপর চুপচাপ চেয়ে রইলেন।

কোটরগত চকচকে দুটো অনুযোগ-ভরা চোখ, হাড় বার-করা চোয়াল, আর শুকনো কালচে মুখের দিকে চেয়ে রাধারাণীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল কেমন। সব সময় এই ক্ষয়ের জ্যোতি পোড়া চোখে পড়েও পড়ে না। বিনা ভনিতায় বললেন, আর কতকাল পড়ে থাকব এখানে, সেরেই তো উঠেছি, ডাক্তারকে বল, বাকি চিকিৎসা বাড়িতেই হতে পারবে–আর ভালো লাগছে না।

ভূতনাথবাবু চেয়েই আছেন।

কি কারণে মিট-সেটাই একবার খুলে দেখা দরকার হয়ে পড়ল রাধারাণীর। তাড়াতাড়ি ঘুরে বসে ঝুঁকে সেদিকে হাত বাড়ালেন।

## দিনবদল



www.bengaliebook.com

বৃন্দাবন পালের পর্যন্ত একজন অনুগত সহকারী আছে। যারা জানে বৃন্দাবন পালকে তারা হাসে। কারণ বৃন্দাবনকেই তারা চিনির বলদ বলে ডাকে। তার সহকারী অমল দাস তাহলে কি?

বৃন্দাবন সীরিয়াস মানুষ। তার কানে তুলো পিঠে কুলো। কারো ঠাট্টা তামাশার ধার ধারে না। একাগ্র নিষ্ঠায় তার মনিবের সেবা করে চলেছে। যে কাজ তাকে করতে হয় তার ঝক্কি অনেক, বিপদও কম নয়। এ যাবত ঝামেলা অনেক পোহাতে হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের বিপদে কখনো পড়েনি। দুই একবার পড় পড় হয়েছে, কিন্তু মনিবই সামলেছে। মনিবের টাকার ওপর ছাতা পড়ছে, তিনি সদয় হলে টাকার ঝাটা মেরেই মুশকিল আসান করে দিতে পারেন।

বৃন্দাবনের খুব আশা, মনিব তার ওপর একদিন সত্যিকারের সদয় হবেন, ওর কদর বুঝে আর প্রভুভক্তি দেখে তার বুকের তলার কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রে মোচড় পড়বে। তখন আর বৃন্দাবনকে পায় কে। মনিব তখন একটু হাত ঝাড়লেও যা পড়বে তাতেই বাকিটা কাল পায়ের ওপর পা তুলে সুখে কেটে যেতে পারবে। মনিব লোকটা যেমনই হোক, তার বুকের তলায় স্নেহ মায়া মমতা যে কিছু আছে সে-তো তার কুকুর দুটোকে দেখলেই টের পাওয়া যায়। স্থূল বপুখানা-নরম গদির সোফায় ছেড়ে দিয়ে আর ভারী। ভারী পা দুখানা মস্ত মস্ত দুটো অ্যালসেসিয়ানের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে যখন আদর করেন, তখন তার থলথলে মুখে স্নেহ উপছে পড়তে দেখেছে বৃন্দাবন, আর সহকারী অমলকেও দেখিয়েছে।

একটাও ছেলেপুলে নেই, বউটাও মরে ভূত না কি পেত্নী হয়ে গেছে কোন্ কালে-এ-হেন ভাগ্যবান মনিব টাকার আণ্ডিল আগলে বসে থাকবেন আর কতকাল? মা-লক্ষ্মীর কৃপায় কুকুরের প্রতি ওই দরদের বাতাসটুকুও যদি বৃন্দাবনের দিকে ফেরে তাহলেও দিন ফিরে গেল।

সহকারী অমল, অতশত বোঝে না। ভবিষ্যত ভেবে মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ে। বৃন্দাবন তখন তাকে ওই সব কথা বলে, বোঝায়, আশ্বাস দেয়। বলে, দিন। ফিরবেই একদিন দেখে নিস, ওই খামখেয়ালী মনিব হঠাৎ দেখবি

দয়ার অবতার বনে গেছে। নির্ঘাত তাই হবে, উইল করে আধাআধি না হোক, চার ভাগের। একঙ্গ সম্পত্তি দেখবি আমাকেই দিয়ে গেছে।...বয়েস তো বাহাত্তর পেরুতে চলল, এত সব কাণ্ড মাণ্ডর পর কত দিন আর বাঁচবে–নেহাত পয়সার জোরে শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি সামলে আসছে, নইলে কবে অক্কা পেয়ে যেত। কেউ তো বোকা বলবে না তাকে, নিজেই বোঝে সব, এই জন্যেই উকীল অ্যাটর্নির আসা-যাওয়া লেগেই আছে। দেখছিস না?... আর আজকাল কেমন মিষ্টি মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকায় লক্ষ্য করেছিস?

অমল দাস জবাব দেয় না, গুরুটি তার জবাবের প্রত্যাশাও করে না। নিজের অনাগত সুখ-স্বপ্নে বিভোর সে। তার বয়েস এখন উনচল্লিশ। আর এক আধ বছরের। মধ্যে দিন বদলাবে। নিশ্চয় বদলাবে। তখন ভোগের বন্যায় গা ভাসাতে বাধা কোথায়। সমস্ত রকমের কাল্পনিক বাধা একের পর এক নাকচ করে দিয়েছে। টাকা থাকলে সব বাধা জল। আর বয়েসটা তো কোন বাধাই নয়। তার মনিব এই বাহাত্তর বছরেও ভোগী। অবশ্য ভোগের সাধ যত আছে এখন আর সাধ্য তত নেই। তার ফলে যে সব কাণ্ড করে আনন্দ পেতে চেষ্টা করেন ভাবতে গেলে বৃন্দাবনের একটুও ভাল লাগে না। অত বয়সে ভদ্রলোকের একটু ধম্ম কম্মে মতি ফিরলে বরং বৃন্দাবনের সুবিধে হত। না, অত বয়সে বৃন্দাবন মনিবের মত হ্যাংলাপনা করবে না। বড় জোর ষাট বছর পর্যন্ত আনন্দের সময়। চল্লিশে তার দিন ফিরলেও আনন্দের ঢের সময়। পড়ে থাকবে। কম করে বিশটি বছর। অতএব তার হতাশ হবার কিছু নেই।

এ-সব কথা সে হামেশাই অমলকে শোনায়। অমল তার ভোগের ছটকাও কিছু কিছু জেনেছে। যেমন; একটা ভাল বাসায় থাকবে, ভাল জামা-কাপড় পরবে, একটু ভাল খাবে-দাবে, আর মনের মত একটা মেয়ে এনে ঘর বাঁধবে।...ওই পোড়ারমুখি যদি কোথাও থেকে তাকে দেখে তখন, হিংসেয় কালি হয়ে যাবে।

পোড়ারমুখিটা কে তাও অমল ভাল জানে। তারই মাসতুতো দিদি শ্যামা। সম্পর্কে অমল বৃন্দাবনের মাসতুতো শ্যালক। দুজনকেই একসঙ্গে আশ্রয়

দিয়েছিল বৃন্দাবন। অমলের তখন পনের বছর বয়েস আর মাসতুতো দিদির একুশ। আর বৃন্দাবন পালের তখন একত্রিশ। অমলের বয়েস এখন তেইশ আর শ্যামাদি আজ যেখানেই থাক– তার উনত্রিশ।...শ্যামাদি বৃন্দাদার ঘর করেছে মাত্র দুটি বছর। তার মধ্যেই অনেকবার ঘর ভাঙার দাখিল হয়েছে, তবু কোন রকমে টিকে ছিল। বৃন্দাবন পাল তার মনিব সুমন্ত চৌধুরীর খাস সরকার আর মোসাহেব ছিল তখন। ফাঁই ফরমাশ খাটা বা হঠাৎ দরকারে ছোটাছুটির জন্য কর্তার ড্রাইভারের পাশে বসে স্টুডিওতেও আসতে হত। স্টুডিওর অনুগ্রহ-প্রত্যাশীদের কাছে সেই কারণে তার কদরও ছিল একটু। কর্তাটি ছবির রাজ্যের নামজাদা প্রডিউসার।

নিজের গুণেই বিশেষ নজরে পড়েছিল সে। দুদুটো ছবির ভবিষ্যত ভেবে কর্তা যখন মুষড়ে পড়েছিলেন, তখন টেকনিশিয়নদের সঙ্গে স্টুডিওতে সেই ছবি তন্ময় হয়ে দেখে বৃন্দাবন ছাড়া ওরকম ভবিষ্যদ্বাণী আর কেউ করেনি, কারণ কর্মকর্তারা মালিকের দুশ্চিন্তার ভাগ নেবার ফলে ভবিষ্যত সম্পর্কে রায় তেমন আশান্বিত হয়ে উঠতে পারেনি। বোকার মত সেই ছবিই হিট করবে রায় দেবার ফলে; তখনকার মত বৃন্দাবন বরং মালিকের বিরক্তিভাজন হয়েছিল। কিন্তু, সত্যি সত্যি সেই দুটো ছবিতেই অপ্রত্যাশিত ভাল লাভ হয়েছিল মালিকের। চৌধুরীমশায় সেইজন্য তাকে পুরস্কারও দিয়েছিলেন। এরপর দুদুটো প্রেস্টিজ ছবি করেছিলেন কর্তা। মালিকের। সঙ্গে সকলে একবাক্যে রায় দিয়েছে–ছবি হয়েছে বটে, একেবারে হাট! চৌধুরীমশাই সাগ্রহে বৃন্দাবনের মতামত জানতে চেয়েছেন। কিন্তু মাথা চুলকে সে বলেছে, আমি সবটা ঠিক বুঝতে পারিনি হুজুর-একটু হাই জিনিস তো...।

অন্য মোসাহেবরা হেসে উঠেছে। কর্তা নিজেও। কিন্তু ছবির ফলাফল দেখে সকলের চক্ষুস্থির। ওই দুই ছবিতে বহু টাকা লোকসান হয়েছিল মালিকের।

ফলে কর্তার কাছে বৃন্দাবনের খাতির আরো বেড়ে গেছে। বৃন্দাবনের ভাল লাগলে তবে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এই করেই ছবির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে লাগল বৃন্দাবন পাল। একটা দুটো করে কাজের ভার পড়তে লাগল তার ওপরে। বারকয়েক আধাবস্তি গোছের গরিব মহলে হানা



www.bengaliebook.com

দিয়ে ছবির জন্য কিছু একস্ট্রা মেয়ে সংগ্রহ করে দেবার ফলে এই কাজটাই ক্রমশঃ তার ওপর বর্তাল। নায়িকা বা সহ নায়িকা ছাড়াও এক সীন দুসীনের জন্য অনেক ভদ্র চেহারার মেয়ের দরকার হয়। দিন পিছু তাদের তিন টাকা পাঁচ টাকা রেট আর দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা। এই কাজেই দস্তুরমত নাম কিনে ফেলল বৃন্দাবন পাল। সে যে-সব মেয়েদের আনে তাদের বেশির ভাগই মোটামুটি ভদ্র চেহারার, কেউ কেউ কথাবার্তাও কইতে পারে বেশ, আবার দুই একজন সুশ্রী মেয়েও বেরিয়ে যায় তাদের মধ্যে। ছবিতে মেয়েদের কোন ভিড়ের রোল থাকলেই বৃন্দাবন পালের কাজ বাড়ল।

কর্তা এ-কাজের জন্য একটা অল সেকশন ট্রামের মান্থলি টিকিট বরাদ্দ করে দিয়েছেন তাকে। আর মাইনেও কিছু বাড়িয়েছেন, কারণ, এ-কাজে একটু ভদ্র জামা-কাপড় দরকার।

বৃন্দাবন পাল সোৎসাহে এই কাজ করে চলেছিল। কিন্তু মুশকিলে ফেললেন তাকে কর্তা নিজেই। এক্সট্রা মেয়েদের মধ্যে কাউকে মনে ধরলেই ওকে ডেকে কানে কানে কিছু প্রস্তাব করেন। উদার মুখে দশ পাঁচ টাকা আগাম বখশিসও করে ফেলেন। তাকে। ওই প্রস্তাব শুনে গোড়ায় গোড়ায় ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করত বৃন্দাবন পাল। কিন্তু ভগবানের নাম করে সেই দুরূহ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে হয়নি। কর্তার নাম করে ভবিষ্যতের অনেক রকম লোভ-টোভ দেখিয়ে যেভাবেই হোক কর্তার পছন্দের রমণীটিকে বশে আনত। দেরি হলেও লেগে থাকত, কিছু খরচপত্র করত এবং শেষ পর্যন্ত বিফল হত না।

...কিন্তু মালিকের এই রোগ বাড়তেই থাকল। ছবির জন্য একস্ট্রা মেয়ের কোন সীন না থাকলেও কর্তার ঝোঁক চাপলে তার মনের মত মেয়ে সংগ্রহের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় তাকে। সে রকম কাউকে পেলে কর্তা দরাজ হাতে টাকা দেন, আবার সেরকম না হলে তার পছন্দের খোটাও দেন। এই ফরমাশ খাটতে গিয়ে এক একসময় গলদঘর্ম হয়ে ওঠে বৃন্দাবন পাল।



www.bengaliebook.com

একবার একদঙ্গল মেয়ের মধ্যে থেকে একটি উদ্বাস্তু মেয়েকে আর স্টুডিওতে না নিয়ে গিয়ে সোজা নিজের ঘরে তুলল বৃন্দাবন। সেই মেয়ে অমলের মাসতুতো দিদি শ্যামা। কালোর উপরে দিব্যি সুশ্রী মেয়ে। আর চৌকসও। ঠারেঠোরে তাকাতে জানে, হাসতে জানে। এই মেয়ে কর্তার চোখে পড়লে আর রক্ষা নেই জানে। চোখে পড়তে দিল না। নিজেই বিয়ে করে বসল। দিন কয়েক বাদে শ্যামা তার মাসতুতো ভাই অর্থাৎ অমলকেও তার নিজের সংসারে টেনে নিয়ে এল। অমলেরও আর তিনকুলে কেউ নেই।

কিন্তু বৃন্দাবনের সংসার বেশিদিন টিকল না। তার ঘরে ছবির জগতের নীচু পর্যায়ের কর্মীদের আনাগোনা ছিলই। কিছু দিনের মধ্যেই শ্যামার চোখ খুলে গেল। বৃন্দাবন ওকে বিয়ে করে বঞ্চিত করেছে কানে এমন মন্ত্র দেবারও লোক জুটল। তার ওপর স্বামীটি কি কাজ করে বেড়ায় জানার পর থেকে শ্যামা বীতশ্রদ্ধ তার ওপর। কতদিন আঁঝের মুখে বলে বসেছে, তুমি আবার একটা মানুষ নাকি, কোনদিন তোমার মনিবের হুকুম হলে আমাকেই পাঠিয়ে দেবে তার কাছে-তুমি না পারো কি?

বৃন্দাবন পাল মনে মনে ভাবে মনিবের হুকুম হলে শ্যামা আর তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে না, ছবিতে নামার আশায় নিজেই ছুটবে তার কাছে। মেজাজ ভাল থাকলে শ্যামা অনেকদিন মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছে।

যাই হোক, দুবছর না যেতে শ্যামা নিজেই তার ব্যর্থ জীবন সফল করতে ঘর ভেঙে দিয়ে চলে গেল। এক রাত্রিতে বৃন্দাবন ফিরে দেখে বউ ঘরে নেই। আর দিন দুই যেতে বুঝে নিল ওই বউ ঘরে আর ফিরবেও না।

কিন্তু চির অনুগতের মতই অমল দাস থেকে গেল তার কাছে। বউ চলে যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছল বৃন্দাবনের। সেই ঘেন্নার ভাগ অমল দাসও নিয়েছিল। দুই এক বছর যেতে বৃন্দাবনের মন বদলেছে। আবার সে সুখের সংসার করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অমল দাসের মন বদলায়নি। বৃন্দাদার কাজে সে যথেষ্ট সাহায্য করে বলেই

ঘেন্না তার আরো বেড়েছে। মেয়েগুলোই দুনিয়ায় যত অনিষ্টের মূল ভাবে সে। বৃন্দাদাকে সে সাহায্য করে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবেই। কসাইয়ের যেমন মাংস কাটা কাজ, অনেকটা সেই রকমই মনোভাব। বৃন্দাদার দিন ফিরলে তারও দিন ফিরবে এটুকুই আশ্বাস। কিন্তু দিন ফিরলেও কোন মেয়েকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখে না সে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেল। কলকাতার দিনকাল তখন। খুব খারাপ। হামলা মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। কিন্তু অমল নিঃশত্রু ভাবে নিজেকে, তাই রাত্রিতেও নিঃশঙ্কে চলাফেরা করে।

সবে রাত তখন আটটা সাড়ে আটটা হবে। স্টুডিওর পিছনের নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিল। বৃন্দাদার জন্য অর্থাৎ তার মালিকের জন্য একে একে তিনটে মেয়ের কাছে টোপ ফেলেও বিফল হয়েছে। ফলে ভিতরটা তেতে আছে তার। দুনিয়া থেকে মেয়েগুলোকে নির্মূল করে দিতে পারলে দিত। ওই বুড়ো হাঙর অর্থাৎ বৃন্দাদার মালিকের বিকৃত আনন্দের নিবৃত্তি যে কবে হবে তাও জানে না।

উঁচু রাস্তা, দুদিকে পোড়ো জমির ঢল। হঠাৎ অন্ধকারে মেয়ের গলার গোঙানি শুনে থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ, স্পষ্টই একটা চাপা আর্তস্বর কানে আসছে বাঁদিকের ঢল থেকে। অন্ধকারে ঠেকে-ঠোকে নীচু জমির দিকে পা বাড়ালো। আধা-আধি নেমেই সর্বাঙ্গ অবশ। সামনেই পুঁটলির মত পড়ে আছে একটা মেয়ে, অতি যন্ত্রণায় সে-ই কাতরাচ্ছে।

অমল দাস ঝুঁকে দেখল। তারপর পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করে হাঁট মড়ে বসে দিয়াশলাই জ্বালল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কাঠিটা নিভে গেল আবার।

অমল দাস তার মধ্যে যা দেখার দেখে নিল। বছর উনিশ কুড়ির একটা অপুষ্ট মেয়ে। কিন্তু বেশ সুশ্রী মুখখানা। এক পিঠ চুল। হাত পা গা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে।

কি যে করবে অমল দাস ভেবে পেল না। কিন্তু মেয়েটাই ককিয়ে উঠল, আমাকে তোলো

অমল মেয়েটাকে টেনে বসাল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটু বাদে ওকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আমাকে বাঁচাও, ছুঁচোগুলো ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছে! একটু জল খাব–

কিন্তু জল কোথায় মিলবে সেখানে? অমল টেনে তুলল তাকে। তারপর একরকম আলতো করেই রাস্তায় এনে দাঁড় করাল। পরনের জামা-কাপড় যেভাবে ছিঁড়েছে। আলোর দিকে যাবে কি করে ভেবে পেল না।

অন্ধকারে ভেঁপু বাজিয়ে একটা রিকশা আসছে। অমল দাস অন্য কোন দিশা না পেয়ে তাতেই উঠে বসল মেয়েটাকে নিয়ে। সেও প্রায় কোলে করে তুলতে হল। রিকশাওলাকে কৈফিয়ত দিল, হঠাৎ পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে, তাই

রিকশাওলাটা বিহারী। চাপা গলায় অমল মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাড়ি কোথায়? কোথায় যাবে?

কিছু জবাব পেল না। পিছনে মাথা এলিয়ে বেহুশের মত পড়ে আছে মেয়েটি। ধাক্কা দিল। কোন সাড়া নেই।

অমল ঘামতে শুরু করেছে। কি করবে ভেবে না পেয়ে রিকশা নিয়ে সোজা নিজেদের ডেরায় চলে এল। দরজা খোলা দেখে আর আলো দেখে বুঝল বৃন্দাদা ঘরে আছে। একলাফে নেমে দু-এক কথায় ব্যাপারটা বলে তাকে টেনে নিয়ে এল। .. অজ্ঞান হয়ে আছে, তাকে নিয়ে এখন কি করা হবে?

কিন্তু বৃন্দাদাকে নিয়ে রিকশার কাছে এসে অমল হাঁ। মেয়েটা রিকশা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ। নিঃশব্দে কাঁদছেও।

অমল দাস বলল, তুমি না অজ্ঞান হয়ে ছিলে?

জবাব না দিয়ে মেয়েটা করুণ দুটো চোখ মেলে তাকাল শুধু।

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি বাধা দিল, অজ্ঞান হলেও জ্ঞান ফিরেছে দেখছিস না, এস এস, ঘরে এস। হাত ধরে ঘরের দিকে টানল তাকে। কিন্তু মেয়েটা সত্যিই জখম হয়েছে, হেঁটে আর আসতে পারছে না। বৃন্দাদা টেনেটুনে তাকে ধরে এনে বসাল। তারপর সর্বাঙ্গের আঘাত লক্ষ্য করে তক্ষুনি ডিসপেনসারির উদ্দেশ্যে ছুটল।

দুহাত কোমরে তুলে অমল দাস গম্ভীর মুখে তাকে দেখল একটু।

তোমার নাম কি?

অতসী।

ওভাবে ওখানে পড়ে ছিলে কেন?

ওরা চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

অমল দাস আঁতকে উঠল, কারা ফেলে দিয়েছিল?

সংক্ষেপে যা শুনল তাতেই চক্ষুস্থির তার। কতগুলো বদমাস ছেলে অতসীকে জোর করে রাস্তা থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল–পাড়ার চেনা গুণ্ডা ছেলে সব। সৎ মায়ের সঙ্গে তাদের খুব ভাব ছিল, মনে হয় সৎ মাকে টাকাও দিয়েছে ওরা। অনেক দূরে আসার পরে একটা পুলিশের গাড়ি হঠাৎ পিছু ধাওয়া করতে সেই ছুটন্ত গাড়ি থেকে ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। তারপর আর কিছু জানে না।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা কাটিয়ে অমল দাস বলল, রিকশাতে জ্ঞান ছিল তোমার তবু অজ্ঞানের ভান করে ছিলে কেন?

তুমি তাহলে বাড়ি দিয়ে আসতে চাইতে আমাকে।

বাড়ি যাবে না তো কোথায় থাকবে?

জানি না। বাড়ি গেলে বাবা আর সৎমা এবারে মেরেই ফেলবে আমাকে।



www.bengaliebook.com

বাবা কি করে?

কলে কাজ করে...ভয়ানক মদ খায়। আর মায়ের কথা শুনে আমাকে মারে। আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসতে চাইলে আমি আত্মহত্যা করব।

মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখল অমল দাস। রোগা একটু, নইলে মন্দ না। খাইয়ে দাইয়ে পুষ্ট করে তুলতে পারলে বৃন্দাদার লাভ মন্দ হবে না। মরুকগে, বৃন্দাদাই দায় সামলাক এখন, তার ভেবে কাজ কি?

বৃন্দাবন পাল একজন চেনা কম্পাউণ্ডার নিয়ে এল। সে ওষুধপত্র দিয়ে চলে গেল। তারপর অমলের মুখে সব শুনে বৃন্দাবনও খুব খুঁটিয়ে দেখে নিন মেয়েটাকে। তার চাপা আনন্দ গোপন থাকল না। অতসীর আদর যত্নের ব্যবস্থায় কোন রকম। কার্পণ্য করল না। আশ্বাসও দিল, তার সুব্যবস্থা সে-ই করে দেবে।

আর ভাগ্য এমনই, পরদিনই একগাদা ভাল ভাল একস্ট্রা যোগাড় করতে হল নতুন ছবির কাজের জন্য। তাদের মধ্য থেকে কর্তার চোখে লাগা দু দুটো মেয়ে একেবারে জলের মত টোপ গিলল। কর্তা তাদের এক মাসের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন নিজের বাগানবাড়িতে। আর সেই সঙ্গে বৃন্দাবনকে ঝোঁকের মাথায় দুশ টাকা বখশিস করে ফেললেন।

অতসীকে খুব পয়মন্ত মেয়ে ধরে নিল বৃন্দাবন।

এক মাসের মধ্যেই খেয়ে দেয়ে আর শান্তিতে থেকে শ্রী ফিরে গেল অতসীর। বৃন্দাবন দুচোখ ভরে দেখে তাকে আর আরো ভাল দেখার আশায় দিন গোনে। তাছাড়া মেয়েটার মস্ত গুণ, সুন্দর রাঁধতে পারে–খেতে বসে মনে হয় অমৃত খাচ্ছে। অমল আর বৃন্দাবন মাঝারি ঘরটায় থাকে, আর খুপরিটাতে অতসী থাকে।

এক মাসের মধ্যেই অমলের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলল বৃন্দাবন। অতসীকে বিয়ে করবে। এদিকের খুপরি থেকে অতসী নিজের কানেই শুনল প্রস্তাবটা। অমলের জবাবও। এরা কেউ রেখে ঢেকে কথা বলে না।

অমল জবাব দিল, কেন ঝামেলায় পড়বে আবার, তার থেকে আর একটু তরতাজা করে নিয়ে তোমার কর্তার কাছে পাঠিয়ে দাও, এদিকে ফোটো ভাল উঠলে ছবিতে একস্ট্রা করেও রোজগার করতে পারবে–মোট কথা তোমারও পয়সা হবে ওরও হিল্লে হবে।

বৃন্দাবন পাল বিরক্ত। বলল, তুই বড় নৃশংস হয়ে গেছিস। অতসী আমার লক্ষ্মী, ওকে আমি কোথাও পাঠাতে পারব না– দিন-টিন দেখে সামনের মাসেই বিয়েটা করে ফেলব ভাবছি।

এদিকের খুপরি থেকে অতসী তার উদ্দেশে বড়-সড় ভেঙচি কাটল একটা। কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহলও খুব। অমলদা ওকে কার কাছে পাঠিয়ে পয়সা রোজগারের কথা বলছে? ফোটো ভাল হলেই বা কি করবে?

বৃন্দাবন বেরিয়ে যেতে তার ওপর চড়াও হল। বাড়িতে মাঝে মাঝে দুই একটা মেয়ে এক একটা আবেদন নিয়ে আসে দেখে, কি চায় ঠিক বুঝে ওঠে না। কিন্তু গোড়া থেকেই অমল দাস অতসীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি বড় একটা। কেবল খেতে বসলে খুশি। বলে, তুই রাঁধিস বেশ, না হলে বৃন্দাদার কথায় তোকে কখনো বাড়িতে রাখতুম না–মেয়েছেলের ঝামেলা ভাল লাগে না।

অতসীও ফোঁস করে ওঠে, ঝামেলাটা কি?

ঝামেলা না তো কি, যে দেখে সে-ই জিজ্ঞেস করে কে?

তা জবাব দিলেই পারো?

কি জবাব দেব, বদ ছেলেদের ফুর্তি ফসকে এখানে এসে গেছে?

তা কেন, বলবে ভবিষ্যতে আপনার জন কেউ হবে।

অমল ওকে মারার জন্য তেড়ে আসে। অতসী ছুটে পালায়। যখন তখন এইরকম খটাখটি লেগেই আছে। যা করতে বলে একবারে শোনে না। তর্ক করে, অবাধ্য হয়। শাসন করতে গেলে বৃন্দাদার কাছে পালায়।



www.bengaliebook.com

সেদিন অতসী সরাসরি এসে কৈফিয়ত তলব করল, কি ব্যাপার তোমাদের বল তো? আমাকে কার কাছে পাঠাবার কথা বলছিলে? আর ফোটোর কথাই বা কি বলছিলে?

অমল খেঁকিয়ে উঠল, তা দিয়ে তোর দরকার কি?

দেখ, বড় ভাইয়ের বউ হতে যাচ্ছি, দস্তুরমত মান্যিগন্যি করবে আমাকে–আর খবদ্দার তুই-তুকারি করবে না। তা আমাকে নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমি না শুনলে কে শুনবে?

যা যা এখান থেকে–বৃন্দাদার ভীমরতি ধরেছে

কেন, আমাকে বিয়ে করতে চায় বলে? তা তোমার আপত্তি থাকে তো জোর। দিয়ে বল না?

আমার কি দায় পড়েছে?

তাহলে কুপরামর্শ দিচ্ছিলে কেন?

দিচ্ছিলাম মেয়ে জাতটা অতি অখাদ্য জিনিস বলে।

অতসী হেসে ফেলল।–দুই একটা মেয়ে খেয়ে দেখেছ? বলে হাসতে হাসতেই পালাল সেখান থেকে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অতসীর বেশ ভাবনাই ধরে গেল। এখান থেকে নড়ার ইচ্ছে একটুও নেই। কিন্তু বৃন্দাবন পাল বিয়ে করতে চাইলেই বা ঠেকাবে কি করে? তাকে বিয়ে করার ইচ্ছে একটুও নেই। ওদিকে আর একজন তো কাছে গেলেই মারতে আসে।

ইনিয়ে বিনিয়ে বৃন্দাবন প্রস্তাবটা করেই ফেলল একদিন। তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। প্রায়ই একটু একটু জ্বর আর বুকের ব্যথায় ভুগছে। তাই মাঝে মাঝে আর কাজে বেরোয় না। সেই অবকাশে একদিন কথাটা বলে ফেলল।



www.bengaliebook.com

শুনে অতসী ভয়ানক বিমর্ষ।–তা তো এখন হয় না। কেন? কেন হয় না?

আমার যে ভয়ানক ফাড়াআছে। জ্যোতিষী আমাকে দেখে মাকে আর বাবাকে বলেছিল। ফাড়ানা কাটতে বিয়ে হলে আমারও ক্ষতি হবে, যে বিয়ে করবে তারও খুব অনিষ্ট হবে। এই জন্যেই তো বাবা ঘরে রেখেছিল–

বৃন্দাবন চিন্তিত। কতদিন ফাড়া আছে?

একুশের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

এখন কত?

এই কুড়ির মাঝামাঝি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বৃন্দাবন, একটা বছর এমন কিছু দীর্ঘ নয়। তার পরেই কি মনে পড়তে পুলকিত। সেও তো গণক ঠাকুর দিয়ে হাত আর ঠিকুজী দেখিয়ে রেখেছে, আরো এক বছরের মধ্যে তার দিন ফেরার কথা। যোগাযোগ একেই বলে, দিন তাহলে সর্বরকম ভাবেই বদলাবে।

অতসীর ফাড়া কাটার কথা আর প্রায় একই সময় নিজের দিন বদলের কথা অমলকে না বলে পারেনি বৃন্দাবন। তুই তো কিছুই বিশ্বাস করিস না, কেমন মেলে দেখ এখন

শুনে অমল ভুরু কুঁচকেছে শুধু। এসব প্রসঙ্গই বিরক্তিকর তার কাছে।

বিরক্তি দিন দিন বাড়তেই থাকল, কারণ ভয়-ডর গিয়ে অতসীর হামলা দিনে দিনে বাড়ছে তার ওপর। কারণে অকারণে ঝগড়া করে, আবার বৃন্দাদার কাছে নালিশ করে ওকে বকুনি খাওয়াতে চেষ্টা করে। ওর কাজের জিনিস লুকিয়ে রাখে, ইচ্ছে করে জামার বোতাম ভেঙে রাখে। নিজেই অবশ্য আবার বার করে দেয়, বা পরিপাটি করে নতুন বোতাম লাগিয়ে দেয়। সেলাই করতে করতে দাতে করে সুতো কাটে যখন, অমলের দেখতে এক এক সময় ভালই লাগে। কিন্তু ভাল লাগার মেজাজ সব সময় থাকে না।



www.bengaliebook.com

উল্টে বেশির ভাগ সময় হাত নিশপিশ করে। কিন্তু গায়ে আঙুল তুললে বৃন্দাদার কাছে দশখানা করে লাগায়।

রেগে গিয়ে অমল বলে, তুই এখন থেকেই চাস না যে আমি এখানে থাকি নিজের একটা পেট আমি চালাতে পারব না ভাবিস, কেমন?

গম্ভীর মুখে অতসী জবাব দেয়, একটা পারবে, দুটো পারবে কিনা আমার সেই ভাবনা।

কি, বৃন্দাদার মত হাঁদা পেয়েছিস আমাকে? আমি যাব ঝামেলা বাড়াতে! বৃন্দাদা ছাড়ছে না বলে, নইলে আমি পালাতেই চাই, বুঝলি? তোর ফাড়া কাটতে আর বাকি কত?

ভাল মুখ করে অতসী-জবাব দেয়, সে-তত তোমার ওপর নির্ভর করছে– কাটিয়ে দাও না চট করে।

অমল দাস ভাবে, পূজো আর্চা দেওয়া বা জ্যোতিষীর কাছে ধরনা দেওয়ার অনুরোধ। জবাব দেয়, আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার সময়ও নেই আর ওসব কিছু বিশ্বাসও করি না। নিজেদেরটা নিজেরা বোঝগে যাও-বড় নিশ্বাস ফেলে অতসী জবাব দেয়, মেয়েছেলে…কত আর পারি।

এক বছরের দরকার হল না, মাস আষ্টেকের মধ্যে বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই দিন বদলের চাকাটা ঘুরে গেল। অতসীর ফাড়া কাটল, কিন্তু এতটা অকরুণভাবে কাটাতে চায়নি সে।

বৃন্দাবন আগের থেকে আরো বেশি ভুগছিল। কিন্তু মনিবের ভ্রূকুটির ভয়ে আর রোজগারের আশায় অসুস্থ শরীর নিয়েই কাজে বেরুতে হত। এরই মধ্যে অঘটন ঘটে গেল। মনিবের কাছে মোটা বখশিসের ইংগিত পেয়ে একটি মোটামুটি শিক্ষিতা মেয়েকে লোভের টোপে প্রায় আটকে ফেলেছে ভেবেছিল। অদূর ভবিষ্যতে ছবির নায়িকা হয়ে ওঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথাও বলেছিল তাকে। আর মনিবের সঙ্গে দেখাসাক্ষংও করিয়ে দিয়েছিল।…মেয়েটার বোধহয় ভালবাসার লোক ছিল একজন, কিন্তু তা



www.bengaliebook.com

নিয়ে বৃন্দাবন মাথা ঘামায়নি। অমন অনেক দেখেছে। কিন্তু সেই ভালবাসার লোক আর দুটো ষণ্ডামার্কা লোকের সঙ্গে দিনমানে খোলা রাস্তায় তার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল–তারপর বেদম মার। মুখে বুকে পিঠে কিল চড় লাথি। নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুতে লাগল। বৃন্দাবন পাল অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়াতে লাগল।

তারপর হাসপাতাল। প্রায় সন্ধ্যার মুখে খবর পেয়ে অমল আর অতসী হাসপাতালে ছুটেছে। ওদের দেখে বৃন্দাবন কেঁদে ভাসিয়েছে।

দিন তিনেকের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। আর একটা দিন গেলেই বাড়ি ফেরার কথা। পরদিন বিকেলে তাকে আনতে গিয়ে অমল আর অতসী শোনে বৃন্দাবন পাল মরে গেছে। ডাক্তার জানালো, রাতে করোনারি অ্যাটাক হয়েছিল, দুপুরের মধ্যে শেষ।

দিন তিনেকের চেষ্টায় অমল দাস কর্তা চৌধুরীমশায়ের নাগাল পেল। নতুন ছবি নিয়ে খুবই ব্যস্ত তিনি। বৃন্দাবনের মৃত্যুর খবর কানে এসেছে আগেই। অমলকে পরে। দেখা করতে বলেছিলেন।

বৃন্দাবনের জন্য দুঃখ করলেন একটু চৌধুরীমশাই। বড় কাজের লোক ছিল বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ওর বউটার কি দশা?

বৃন্দাবনের বউ পালানোর খবর চৌধুরীমশাই রাখেন না বোঝামাত্র অমল দাস শুকনো মুখে জানিয়ে দিল, পাগলের মত হয়ে আছে–এদিকে ঘরে একটা কপর্দকও নেই।

বাড়ির সেক্রেটারিকে ডেকে চৌধুরীমশাই হুকুম করলেন, বৃন্দাবনের দুশ টাকা মাইনে আর তিনশটা বাড়তি টাকা নিজে গিয়ে বৃন্দাবনের বউয়ের হাতে দিয়ে আসতে। আর অমলকে বললেন, সে ইচ্ছে করলে বৃন্দাবনের কাজ করতে পারে, কিন্তু তার মত খাঁটি হওয়া চাই।

মনে মনে বুড়ো হাঙরের মুণ্ডপাত করতে করতে সেক্রেটারিকে সঙ্গে করে ডেরায় ফিরল। মেয়েজাতটার ওপরে সে এখন মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ। তাকে

বাইরে দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে অতসীকে টেনে এনে ঘরের মেঝেতে বসিয়ে দিল। পরনের কালো পেড়ে শাড়ির আঁচলে নিজেই ওর মাথা আর মুখ ঢেকে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, খবরদার একটা কথাও বলবি না, মালিকের সেক্রেটারি টাকা দিতে আসছে।

ছুটে গিয়ে সেক্রেটারিকে ডেকে নিয়ে এল। সে ভদ্রলোক মালিকের বক্তব্য শুনিয়ে। সামনে পাঁচশ টাকা রেখে চলে গেল।

অমল দাস ফিরে এসে দেখে অতসী তেমনি ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে আছে, কিন্তু সামনে টাকা নেই।

টাকাগুলো দে।

এক ঝটকায় ঘোমটা সরিয়ে ফেলে ছদ্মকোপে অতসী বলল, আমাকে বিধবা সাজিয়ে টাকার কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? পাবে না যাও

এই রাগটুকু দেখতে কেন যেন অমল দাসের ভাল লাগল। বৃন্দাদা চলে যাবার পর থেকেই কেন যে অমলের দুচোখ থেকে থেকে ওর দিকে ফেরে ঠিক বুঝে ওঠে না। কিন্তু মেয়েছেলেকে আর এই জীবনে আমল দেবে না ও-বৃন্দাদা অসময়ে চলে গেল, ওরাই যত সর্বনাশের মূল। অতসীকে ওই বুড়ো হাঙরের কাছেই দিয়ে আসবে, তাতে মোটা কিছু টাকাও হাতে আসবে। তারপর এই কাজে ইস্তাফা দেবে।

অতএব অতসীকে না রাগিয়ে একটু ভেবে চিন্তে আপোসের সুরে বলল, ঠিক আছে ওই পাঁচশ থেকে আড়াইশ টাকা আমাকে দে, অর্ধেক তোর অর্ধেক আমার

অতসী জবাব দিল, সবটাই তোমার সবটাই আমার।

বিরক্ত হয়ে অমল চোখ পাকাল, তোর মতলবখানা কি শুনি?

পাল্টা ঝাঁঝে অতসী বলে উঠল, ছোটলোকের মত আর তুই-তোকারি করবে না বলে দিলাম! কোপের মুখেই হাসল আবার-মতলব ভাল, টাকার

কথাই ভাবছিলাম দুদিন ধরে, ভগবান জুটিয়ে দিলেন–তোমার বৃন্দাদার মত ওই সব জঘন্য কাজ আর তোমার করা হবে না-ওই মোড়ের মাথায় একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান দাও–আমি তোমাকে পান সাজা শিখিয়ে দেব, আর ফাঁক মত নিজেও দোকানে বধ্ব। ফিক করে হাসল আবার, দোকানে সব পান খাওয়ার হিড়িক দেখবে তখন

অমল দাস তার অবাধ্য চোখ দুটোকে জোর করেই শাসনের গাম্ভীর্যে টেনে আনল।–তারপর?

তারপর নয় তার আগে–তার আগে বিয়ে।

অমল দাস জোর দিয়েই ঝাঁঝিয়ে উঠল, কার সঙ্গে কার বিয়ে?

আমার সঙ্গে শ্রী অমলচন্দ্র দাসের।

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে একটা প্রলোভন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনতে চাইল অমল দাস। ক্রুদ্ধ মুখে বলল আমাকে ওই ফাঁদে পা দেবার মত আহাম্মক পেয়েছিস? বৃন্দাদা অকালে চলে গেল তোদের জন্যে–মেয়েগুলোর জন্যেই সক্কলে মরে বুঝলি? আমি ওর মধ্যে নেই।

অতসী তার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। নির্লিপ্ত মুখ। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মালিক চৌধুরীমশাইয়ের বয়েস কত?

সঠিক না বুঝেই অমল জবাব দিল বাহাত্তর ছাড়িয়েছে।

আর তোমার বৃন্দাদা কত বছর বয়সে গেল?

চল্লিশের আগে।

তাহলে?

কি তাহলে?



www.bengaliebook.com

অতসী আরো গম্ভীর জবাব দিল, তাহলে প্রমাণ হল তুমি একটি পয়লা নম্বরের গবেট। মেয়েদের জন্যে মরলে চৌধুরীমশাই আরো তিরিশ বছর আগে মরে ভূত হয়ে যেত–মেয়েদের জন্যে কেউ মরে না, অন্যের জন্য মেয়েদের যাদের তাড়া করে। বেড়াতে হয় তারাই শুধু মরে।

অমল দাস হাঁ করে শুনল। তারপর হঠাৎই যেন কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হল তার। প্রশংসা-ভরা চোখে জ্ঞানদাত্রীটির দিকে চেয়ে রইল সে।

অতসী মেঝেতে বসেই ছিল তেমনি। এক লাফে এগিয়ে এসে তাকে আচমকা জাপটে ধরে মেঝের ওপরেই গড়াগড়ি খেতে লাগল অমল দাস।

## পথচিত্র

আমার ভাল লাগে। পথে নেমে নিঃশব্দে আমি জীবন-চিত্র দেখি। জীবনের মিছিল দেখি। কেউ আমাকে কিছু দেখায় না। চলমান মানুষগুলো নিজেরা আপনা থেকে এক একটা চিত্র হয়ে আমার সামনে আসে আবার দূরে চলে যায়।

কোন কাজ না থাকলে আমি পথে নেমে আসি। নিরুদ্দিষ্টের মত হাঁটতে থাকি এক-একটা দিক ধরে। খেয়ালখুশি মত কখনো কোন ট্রামে উঠে পড়ি কখনো বা বাসে। কেউ বুঝতে পারে না আমি একজন বেকার দর্শক মাত্র। দেখাটা আমার নেশা।

দেখে দেখে মনে হয় প্রতিটি মানুষের ভিতরে যেন একটা করে সংকল্পের মোটর বসানো। সেই মোটরের দম-মাফিক তাদের ওঠা বসা চলা ফেরা কাদা হাসা। মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি তাদের ভিতরের সঙ্কল্পটি আঁচ করতে চেষ্টা করি। ঠিক হয়। কিনা আমি জানি না। কিন্তু ভাল লাগে। বিশ্বাস, ঠিকও হয়।

বাসের গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে একসঙ্গে পাঁচ সাতটা মুখ আমার মুখের ওপর। চড়াও হতে দেখেছি। আমার সামনের আসনে-বসা লোকটা উসখুস করছে। নেবে যাবার জন্য সে এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবে মনে হয়। আমার চারদিকের লোকগুলোর জোড়া জোড়া চোখ আমারই মুখের ওপর

আটকে আছে কেন তক্ষুনি বোঝা গেল। যে লোকটার সীট ছেড়ে ওঠার সম্ভাবনা তার একেবারে সামনেই আমি। অর্থাৎ সে উঠলে আমারই। ওই সীটটা দখলের সম্ভাবনা।

বসা লোকটা উঠল ঠিকই। সেই মুহূর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যমনস্কের মত আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি। তক্ষুনি হুটোপুটি কাণ্ড বেধে গেল আমার দুপাশে। ওই অন্যমনস্কতার ফাঁকে দুদিকের লোকই সেই খালি সীটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

...ট্রামে বসে আছি। রাতক্রমে জানালার ধারের সীটটাই আমার দখলে। আমার পাশে যে আধবয়সী লোকটি বসে আছে সে কেন যেন ফিরে ফিরে আমার দিকেই তাকাচ্ছে। প্রথমে খেয়াল করিনি। একটু বাদেই করলাম। আমার পথচিত্র দেখার ঝোঁকটা সে ধরতে পারেনি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি দেখে ভাবছে এক্ষুনি হয়তো নেমে যাব আমি। উঠে দাঁড়ালেই সে জানালার ধারটার দখল নেবার জন্য প্রস্তুত।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি মিথ্যে যাচাইয়ের জন্য উসখুস করে উঠল ভিতরটা। আধা-আধি উঠে কোমর বেঁকিয়ে একবার নিচের দিকে ঝুঁকলাম। সাগ্রহে পাশের লোক সেই বসা-অবস্থাতেই সাঁ করে জানালার ধারে সরে গিয়ে পা তুলে আমাকে বেরুবার জায়গা করে দিল। কিন্তু ওইরকম আধাআধি উঠে আসলে আমি কি করছিলাম? হাতের টিকিট মাটিতে ফেলে ঝুঁকে সেটাই আবার কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। সেটা হাতে নিয়ে অবাক মুখ করে লোকটির দিকে তাকাতে সে তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত।

সরি!

ঠিক আছে, বসুন বসুন।

জানালার ধার ছেড়ে দিয়ে আমি তার পাশে বসেছি।

.



www.bengaliebook.com

...ময়দানের নিরিবিলি ধারটা দিয়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে চলেছে। ছেলেটার বয়েস সাতাশ-আটাশ আর মেয়েটার বড় জোর উনিশ। তেমন সুশ্রী নয় আবার তেমন কুরূপাও নয় মেয়েটা। হাত মুখ নেড়ে কথা বলতে বলতে চলেছে। কিন্তু আমার মনে হল তার সঙ্গীটি কথা যত না শুনছে তার থেকে দেখছে ঢের বেশী। তার একখানা হাত মেয়েটার কাঁধের ওপর। সেই হাত পিঠ বেয়ে মাঝে মাঝে মেয়েটার কোমরের দিকে নেমে আসছে। হাত বিশেক পিছনে চলেছি আমি। মেয়েটা পলকের সন্দিগ্ধ চোখে ঘাড় বাঁকিয়ে সঙ্গীর মুখখানা দেখে নিল একবার। সঙ্গীর হাত তক্ষুনি ওর কাঁধের দিকে উঠে গেল। আর পিছনে ফিরে একবার দেখেও নিল।

আমার মন বলছে তেমন অভিজ্ঞ নয় মেয়েটা। অনেকটা সরল বিশ্বাসেই সঙ্গীর পাশে চলেছে। আর মনে হল, ওই পাশের লোকটা নিরাপদ গোছের নির্জনতা খুঁজছে একটু। সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। ওরা এগিয়ে চলেছে। একটু বাদেই আর দেখা গেল না ওদের।

আমি মাঠেই এক জায়গায় বসে পড়লাম।

আধঘন্টার মধ্যেই প্রত্যাশিত নাটক দেখলাম। অন্ধকার কুঁড়ে হনহন করে কেউ একজন এদিকে আসছে। প্রায় ছুটেই আসছে যেন। আমিও অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখছি। একটা মেয়েই। সেই মেয়ে। কেউ যেন ওকে তাড়া করেছে। ও পালাচ্ছে।

আমি ভুইফেঁড়ের মত সামনে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা আঁতকে উঠল।

বললাম, ভয় পেও না, দাঁড়াও–তোমার পিছনের ওই লোক এসে গেছে, এভাবে পালিয়ে পার পাবে না।

বলতে বলতে লোকটা এসে গেল। সেই লোক। দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না ভাবছিল। অস্‌ফুট গর্জনে একটা কটুক্তি করে উঠে আমি তেড়ে যেতেই সে ত্রস্ত কুকুরের মত ছুটে পালাল। আমি মেয়েটাকে বললাম, এবার যাও, আর সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে এসো না।



www.bengaliebook.com

অন্ধকারে আমিও পা চালিয়ে দিলাম।

.

...বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে সেই লোকটার মুখের দিকে আমার চোখ আটকাল কেন জানি না। বেশ ফিটফাট চেহারা। পরনে চকচকে প্যান্ট ঝকঝকে শার্ট। মুখে দু-চারটে বসন্তের দাগ। বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস। সে আমাকে দেখছে না। তার চোখ আশ-পাশের মানুষদের উপর চক্কর খাচ্ছে। এই চিত্র যেন আমার ষষ্ঠ চেতনার ওপর আঘাত দিল একটা। মন বলল, লোকটা নিঃশব্দে অপরের পকেটের সন্ধানে আছে।

মিনিট কতকের জন্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ এক ভদ্রলোক চেঁচামেচি করে উঠল। তার পকেট থেকে মানিব্যাগ খোয়া গেছে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। আশপাশের সকলকেই সন্দেহ করছে ভদ্রলোক। আমি দেখলাম সেই লোকটি তখন বেশ দূরে দাঁড়িয়ে–অনেকটা সামনে এগিয়ে গেছে। আর নিস্পৃহ মুখে ঘাড় ফিরিয়ে একটা দৃশ্য দেখছে যেন।

কপাল ঠুকে একটা কাণ্ড করে বসলাম। টাকা যার খোয়া গেছে তার গা টিপে ওই লোকটাকে দেখিয়ে দিলাম। সে ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরল। লোকটা পাল্টা হুমকি দিয়ে উঠল, কিন্তু মুখখানা আমসি। আরো দুচারজন উৎসাহী লোক তাকে ঘেঁকে ধরে কোমরে হাত দিতেই ব্যাগ বেরুল। তারপর বহুজনের সে কি নৃশংস উল্লাস!

.

এই থেকেই নিজের ওপর একটা দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছল। আমি পথচিত্র দেখি। আর তাই থেকে মানুষের ভিতরের চিত্রটাও স্পষ্ট দেখি।

সেদিন...

বেলা তখন তিনটে হবে। একটা পরিচিত ছোট রাস্তা ধরে আসছিলাম। উদ্দেশ্য মোড়ের ওই দোকান থেকে পান খাব। আমি ওই বিশেষ দোকানের খদ্দের। বলতে গেলে এ পাড়াতেই খানিক দূরে বাসা আমার। ওই অল্পবয়সী

পানঅলাটাকে খুব পছন্দ আমার। দেশ উড়িষ্যায়। এখন বাঙালীই হয়ে গেছে। সব সময় মিষ্টি মিষ্টি হাসে, পান সাজার ফাঁকে শরীর কেমন আছে না আছে খবর নেয়। মজাদার টাটকা খবর কিছু থাকলে তাও বলে ফেলে।

গজ বিশেক এ-ধারেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সামনে কিসের জটলা একটা। একজন মহিলা–বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে বয়সে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর চারদিক থেকে তাকে ঘিরে অনেকে অনেক রকমের কথা বলছে। কেউ কেউ এটা সেটা জেরা করছে। মহিলাকে, কিন্তু উদগত কান্না চেপে মহিলা জবাব দিয়ে উঠতে পারছে না। হাত তুলে। সামনের গলিটা দেখিয়ে দিচ্ছে কেবল।

আমিও দাঁড়িয়ে গেছি। সমাচার যা শুনলাম তার সারমর্ম, মহিলা আজ সকালেই তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে পঁচাত্তরটি টাকা স্বামীর চিকিৎসার জন্য ধার করে এনেছে। স্বামী একেবারে শয্যাশায়ী। ঘরে আর এক কপর্দকও নেই। ওই টাকায় স্বামীর। জন্য ওষুধ আসবে আর তার বুকের এক্স-রে হবে। মহিলা আগে ওষুধটা কিনে নিয়ে বাড়ি যাবে ঠিক করে এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে একটা লোক ছোঁ মেরে তার হাতের ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে ওই গলিতে সেঁধিয়ে গেছে। মহিলা বুক চাপড়ে কেঁদে উঠেছে। কিন্তু গলির ভিতর দিয়ে লোকটা কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে ঠিক কি।

আমি দেখছি। মহিলাকে ঘিরে লোকের সংখ্যা এখন কম করে তিরিশজন। নানা বয়সের লোক। চেনা মুখও আছে এর মধ্যে অনেক। মহিলার দিকে তাকালাম আমি। কান্না থামেনি তখনো। তার হাতে প্রেসকৃপশনটা আছে শুধু।...এক কালে সুন্দরীই ছিল মনে হয়। অনটনের হাড়কাঠে পড়ে সে-সৌন্দর্য গেছে বোঝা যায়। কাঁদছে আর অসহায় চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। শোকে আর উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। ঈষৎ স্রস্ত বসনের ওধারে ওই বুকের ওঠা-নামা দেখছে কেউ কেউ। কেউ পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। কেউ বা জেরা করে করে ছিনতাইয়ের আরো সঠিক হদিশ পেতে চেষ্টা করছে।



www.bengaliebook.com

আমি দেখছি একটা শোক আর হতাশা যেন মহিলার দুচোখ দিয়ে ঠেলে বেরুচ্ছে। ঘরে রুগ্ন স্বামী নিশ্চয় তার প্রতীক্ষায় বসে আছে। কিন্তু সে ঘরে যাবে কোন মুখ নিয়ে?

এ পাড়ায় এ রকম হামলা সন্ধ্যায় বা রাতে আরো হয়ে গেছে। এখন দিন মানেও এই উপদ্রব শুরু হয়েছে। লোকচরিত্র বা পথচিত্র দেখে যদি কোন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তাহলে আমার ধারণা মহিলার এত বড় ক্ষতিটা পূরণ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন একজনের প্রথম এগিয়ে আসা দরকার।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম দুটো দশ টাকার নোট আছে। কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে আমিই এগিয়ে গেলাম। গোল হয়ে যারা ঘিরে আছে মহিলাকে এবং নানা দিক থেকে নানাভাবে দেখছে, তাদের সক্কলকে উদ্দেশ্য করে বললাম, ছিনতাই ঠেকাতে পারছি না, দিনে দুপুরে এই কাণ্ড–এ আমাদের দোষ, আমাদের পাড়ার দুর্নাম। এই আমি কুড়িটাকা দিলাম, আপনারা যে যা পারেন দিয়ে মহিলাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

নিন ধরুন।

মহিলা থমকে তাকাল আমার দিকে। দুগালে তখনো জলের দাগ। কি করবে ভেবে পেল না।

ধরুন, ধরুন। এটা লজ্জা করার সময় নয়–দোষ আপনার নয়, দোষ আমাদের। নোট দুটো হাতে গুঁজেই দিলাম একরকম।

আর একজন দেখলাম পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করছে।

নায়কের ভূমিকা নেবার পর আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। এক-আধজন আবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে আমাকে।

কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরই পকেটে হাত ঢুকছে দেখলাম। পথচিত্র দেখে অভ্যস্ত এই দুটো চোখ আগেই আঁচ করেছিল এ রকম হবে।



www.bengaliebook.com

সরে এসে পানের দোকানের সামনে সবে দাঁড়িয়েছি। বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশের। একটি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে আর হুস হুস করে সিগারেট টানছে। আমাকে দেখেই একটা চোখ ছোট করে আর সেই রকমই হেসে পরিচিতের মতই। জিজ্ঞাসা করল, কি মশাই, টাকা দিয়ে এলেন নাকি?

সঠিক না বুঝে আমি বললাম, হ্যাঁ।

লোকটা ফিক ফিক করে আরো বেশি হাসতে লাগল আর সেই সঙ্গে জোরে দুতিনটে টান মারল সিগারেটে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা করল, কেন দিলেন, সুন্দর মুখের বিলাপটুকু পছন্দ হল?

আমি রুষ্ট-নেত্রে তাকালাম তার দিকে।–ভদ্রমহিলা এ-রকম বিপদে পড়েছেন, এসব কি বলছেন আপনি!

আরো বিচ্ছিরি করে হাসল লোকটা। বলল, ভদ্রমহিলা বিপদে পড়লে আপনাদের দরদ উথলে ওঠে, না? আর সুন্দর মুখ হলে তো কথাই নেই–কোন ভদ্রলোক ও-রকম বিপদে পড়লে ফিরে তাকাতেন?

আমি বললাম, শাট আপ, ভদ্রলোকের মত কথা বলুন, ওই মহিলা কি রকম বিপদে পড়েছেন আপনি জানেন?

হাসছে তখনো।–জানি বইকি, অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার টাকা ছিল ব্যাগে–সেই ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে, এই তো?

আমি থমকে গেলাম।ওই মহিলাকে আপনি চেনেন?

চিনি বইকি। আরো বেশি হাসতে লাগল।ওই দেখুন আরো কত জনে টাকা। পয়সা দিচ্ছে, ওয়াণ্ডারফুল!

ফিরে তাকালাম একবার। পানঅলাটা কি যেন ইশারা করছে আমাকে।



www.bengaliebook.com

আমার ওর দিকে তাকাবার সময় নেই। রূঢ় স্বরে সামনের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতটা চেনেন আর কি জানেন?

মুচকি হেসে সে জবাব দিল, এমনও হতে পারে ওই মহিলার সেই অসুস্থ স্বামীর সঙ্গেই আপনি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। থ্যাংকস্ ফর দি চ্যারিটি–

দ্রুত চলে গেল লোকটা।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। পানঅলা আমাকে বাবু বলে হাঁক দিল। কিন্তু আমি সে ডাকে কর্ণপাত না করে ওই মহিলার দিকেই ছুটে গেলাম। রাগের মাথায় এক থাবা মেরে মহিলার হাত থেকে টাকা পয়সা সব মাটিতে ফেলে দিলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম, মশাইরা, কেউ এক পয়সাও দেবেন না, সব জোচ্চুরি,সব মিথ্যে! মহিলা হতভম্ব মুখে চেয়ে রইল আমার দিকে। যারা চারপাশে ছিল তখনো তারাও চিত্রার্পিত।

হাতে একটা টান পড়তে চেয়ে দেখি ওই পানঅলা টানছে আমাকে। ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে সে। বলছে, শুনুন বাবু শুনুন, খুব ভুল হোয়ে গেল

তিন হাত এদিকে টেনে এনে সে আমাকে বলল, ওই পাগলের কথা শুনে আপনি কি করছেন বাবু!

পাগল!

হ্যাঁ পাগল। দুবছর আগে ওর বউ অন্য লোকের সঙ্গে ভেগে গেছে। তারপর থেকে একটু ভাল চেহারার কোন মেয়েছেলে দেখলেই বলে তার বউ।

আমি বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। ওদিকে লোকগুলোর মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হব-হব করছে। আমি তাড়াতাড়ি এসে ছড়ানো ছিটনো টাকা পয়সাগুলো রাস্তা থেকে কুড়োতে লাগলাম। অনেকে একসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ল, কি হয়েছে মশাই, কি হয়েছে?

আমি জবাব দিলাম, কিছু না মশাইরা, আমার মস্ত বড় একটা ভুল হয়েছে। সবিনয়ে আবার সেই টাকা পয়সা মহিলার সামনে ধরলাম, বললাম,

অপরাধ নেবেন না, নিন। মহিলা হাত বাড়িয়ে নিল। কিন্তু সেই সঙ্গে জ্বলন্ত চোখে আমার মুখটা একপ্রস্থ দগ্ধ করল।

. এখনো আত্মবিস্মৃত তন্ময়তায় আমি পথচিত্র দেখে যাই। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর কখনো নিঃসংশয় হতে পারি না।

## বোরখা

নায়ক ছেড়ে এই কাহিনীর লেখকও আমি নই। আমি অনেকটা মুনশীর কাজ করছি। অর্থাৎ, কারো কাছ থেকে শুনে লিখছি। কিন্তু শোনাটা সেকেন্ডহ্যান্ড নয়, ডাইরেক্ট। এর নায়ক বা নিয়ামক আমাদের কুঞ্জলাল।

আমাদের কুঞ্জলাল বলতে যাঁরা আমাদের সতীর্থ বা সমসাময়িক তারাই চিনবেন। কারণ, কুঞ্জলালকে সেদিন য়ুনিভার্সিটির তো বটেই, আশপাশের কলেজের বহু ছেলেমেয়েও চিনত। প্রণয়ের ব্যাপারে কন্দর্পদেবটি তার বক্ষ-বরাবর একখানি শর উঁচিয়েই ছিলেন। কুঞ্জলালের অবিমিশ্র বাঙালী-প্রীতি আমাদের চক্ষু এবং জঠরগত লাভের কারণ ছিল। তার পয়সায় রেস্টুরেন্টে কত চপ-কাটলেট খেয়েছি, কত ছবি আর খেলা দেখেছি ঠিক নেই।

ইউ. পি-র শেঠেরা টাকা চেনে শুনেছিলাম। ব্যবসা ছাড়া এমনিতেই টাকা খাঁটিয়ে টাকা বাড়ায়। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে কুঞ্জলাল শেঠ-কুলের কলঙ্ক! সে টাকা। গোছাতে জানে না, টাকা ছড়াতে জানে।

তার বাবা মানিকলাল শেঠ লক্ষ্ণৌয়ের নাম-করা চিকন কাপড়ের কারবারী। ভদ্রলোকের অনেকগুলো ছেলেপুলে হয়েছিল, কিন্তু একটাও টেকেনি। কুঞ্জলালের দু-বছর বয়সের সময় তার মাসি তাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। ছেলে নেই ভাবলে যদি ছেলে থাকে, সেই চেষ্টা করতে তার আপত্তি নেই। এই উপায়টা ছেলের মাসি আর আত্মীয়-পরিজনেরা তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছিল। বলা বাহুল্য, যে যোগাযোগেই হোক এই ছেলেটা বেঁচেছে, অন্যথায় এ কাহিনীর সূত্রপাত হত না।



www.bengaliebook.com

কুঞ্জলাল কলকাতায় ম্যাট্রিক পাস করার পর তার বাবা তাকে কারবারে নিয়ে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে, কারণ তখনো ফাঁড়ার ভয় একেবারে কাটেনি। আই-এ পাস করার পর ছেলেকে নিয়ে যাবার আগ্রহ আর একটু বেড়েছিল, কিন্তু মাসি দেননি। বি-এ পাস করার পর তো রীতিমত বকাবকি করেছিলেন, ছেলের এত বিদ্যে তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু ছেলে নিজেই তখন বেঁকে বসেছে–এম এ সে পড়বেই। তারপর এই দুই বছরের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, সুত্রাসে লক্ষ্ণৌ থেকে তাকেই বার কয়েক কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছে।

একবার যখন রত্না বোসকে সপ্তাহে সাতদিন,মাসে তিরিশ দিন কুঞ্জলাল মাসির গাড়িতে চড়াতে শুরু করেছিল। মাসির ছোট গাড়িটা সর্বক্ষণ তারই হেপাজতে থাকত।

সে গাড়িতে আমরাও হামেশা চড়তাম, কিন্তু সেটা তেমন কারো চোখে পড়ত না। রত্না বোস চড়লে পড়ত। বেগতিক দেখে মাসি বাপকে খবর দিয়েছিলেন। বাপ রাশভারি লোক, বিচক্ষণ, গম্ভীর প্রকৃতির। অন্যান্য সকলের দেখাদেখি ছেলেও তাকে কম সমীহ করে না। কিন্তু সেই নতুন বয়সের রোমান্সের জট ছাড়াতে ভদ্রলোকটিকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শেষে মেয়ের বাপের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাকে। মেয়ের বাপেরও অবস্থা ভালো, কিন্তু কুঞ্জলাল যে এমন নিরেট অবাঙালী, সেটা তার বাবাকে না দেখা পর্যন্ত ভদ্রলোক অনুমান করতে পারেন নি। একমাসের মধ্যেই তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই দুজনকেই বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়েছেন। মেয়ের বাবার অবস্থা যদিও ভালো, তবু এই খরচের ভারটা কুঞ্জলালের বাবা বহন করেছেন কিনা, সেই সংশয়ে অনেককে কানাকানি করতে দেখা গেছে। কুঞ্জলাল আমাদের মতই ফুর্তি করে। বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে, আর বিষণ্ন মুখে বিলেতগামী জাহাজ সী-অফ করেছে।

এম. এ পড়তে পড়তেই কুঞ্জলাল দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থবার প্রেমে পড়েছে। এরাও বাঙালী মেয়েই। প্রৌঢ় মানিকলালকে আরও বার কয়েক কলকাতায় ছুটোছুটি করতে হয়েছে। তবে এগুলো প্রথমবারের মত অত



www.bengaliebook.com

জোরাল প্রেম নয়। মানিকলালকে এগুলোর ধকল সামলে উঠতে খুব বেগ পেতে হয়নি। ত্যাজ্যপুত্র করার ভ্রূকুটিতেই ছেলে ঠাণ্ডা হয়েছে।

এই কুঞ্জলাল একযুগ ধরে আমার সহপাঠী। স্কুল-কলেজ বা য়ুনিভার্সিটিতে তার মার্কা-মারা সাজ-সজ্জার বদল হয়নি, জামাকাপড়ের মাপ বদলেছে শুধু। চিকনের কারুকার্য-করা পাঞ্জাবির ওপর কুর্তা চাপিয়ে আসত। আমাদের অনেকবার চিকনের। জামা-টামা উপহার দিতে চেয়েছে। কিন্তু মনে মনে লোভ থাকলেও আমরা ভরসা করে সেগুলো নিতে পারিনি। বরাবর চিকন পরত বলে ওকে সকলে বলত চিকন বাবু। আমাদের কি বলবে ঠিক কি!

তাছাড়া আমাদের বেশভূষা চাল-চলনের প্রতি তির্যক দৃষ্টি হানবার মত অভিভাবক ছিলেন বাড়িতে। লুকিয়ে-চুরিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা দেখা, খেলা দেখা চলতে পারে। লুকিয়ে সাজ-সজ্জা চলবে কেমন করে?

এম-এ পাস করার পর তার বাবার কবলে পড়ল কুঞ্জলাল। ওদের সতের পুরুষের মধ্যে কেউ এম-এ পাস করেনি। তাই কুঞ্জলাল তার বাপের কারবারে টিকে থাকবে এ আমরা একবারও ভাবিনি কুঞ্জলালও ভাবেনি বোধহয়। লক্ষ্ণৌতে সে একটা বড় চাকরিই বাগিয়ে বসেছিল, শুনেছিলাম। সাতদিন না যেতে চাকরি ছেড়েছিল, তাও কানে এসেছে। কুঞ্জলাল লিখেছিল, বাংলা দেশে এতকাল থাকলাম, সেখানেই মানুষ। হলাম, কিন্তু চাকরি কি করে বরদাস্ত করতে হয় তাই শিখলাম না।

চিঠি-পত্রের যোগাযোগ ক্রমশ: স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে। তারপর স্মৃতিও মুছে গেছে। এমন কি বিশ বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর লক্ষ্ণৌ এসেও কুঞ্জলালের কথা একটি বার মনে পড়েনি।

নবাবের দেশ, ইতিহাসের দেশ, বিপর্যয়ের দেশে এসে আমি শুধু লেখার রসদ খুঁজে বেড়িয়েছি। আমি যাঁর আশ্রিত তিনি এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা। ভদ্রলোক ডাক্তার। সুরসিক। সাইকেল রিক্স আর টাঙ্গায় আপদমস্তক কালো বোরখা-ঢাকা মহিলাদের প্রতি আমার একটু বিশেষ লক্ষ্য দেখে



www.bengaliebook.com

তিনি অনেকরকম ঠাট্টা-ইশারা করেছেন। এমন কি কলকাতায় আমার গৃহিণীকে সাবধান করবেন বলেও শাসিয়েছেন।

কিন্তু সত্যিই আমার রহস্যের মত লাগত। বোরখা-ঢাকা প্রায় মুখগুলোই দেখতে ইচ্ছে করত। বোরখা জিনিসটার উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তির খবর জানি না। এককালে ওটা হয়ত নিষেধেরই নিদর্শন ছিল। কখনো-সখনো পুরুষ-সন্নিধানে আসতে হলে চোখের আঁচ ঠেকাবার উপকরণ ছিল হয়ত ওটা। কিন্তু এখন অন্তঃপুরিকাদের পুরুষের সমান তালে পথে বেরনো নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই ওটা আর এখন নিষেধের বস্তু মনে হয় না, অঙ্গসজ্জা বলেই মনে হয়। সহজ সান্নিধ্যেও নিজেকে আড়ালে রেখে পুরুষ-চেতনা সচেতুন রাখার মত লোভনীয় অঙ্গ-সজ্জা। যা দেখলে কৌতূহল জাগে, কল্পনার জাল বুনতে ইচ্ছে করে।

সামনে দিয়ে সেদিন ঝকঝকে একটা প্রাইভেট টাঙ্গায় দুজন বোরখা-ঢাকা মহিলা যাচ্ছিলেন। এক নজর তাকালেই অভিজাত মনে হয়। আমি কত নজর তাকিয়েছিলাম বলতে পারব না। টাঙ্গা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এই বোরখা-পরা মেয়েরা প্রায় সবাই কি অপরূপ সুন্দরী?

সঙ্গী জবাব দিলেন, সুন্দরী অনেক আছে, কিন্তু প্রায় সবাই কেন হবে? কেন বলুন তো?

–আমার তো প্রায় সকলকেই ভারি সুন্দরী বলে মনে হয়। হাতের আর পায়ের যতটুকু দেখা যায় ফুটফুট করছে

সঙ্গী ঠাট্টা করলেন, সকলকেই যেন চাদে ধোয়া, কেমন?

–তাই তো। দেখতে ইচ্ছে করে...।

–আচ্ছা, আপনাকে চেষ্টা করব দু-চারটে দেখাতে। তারপর আর দেখতে ইচ্ছে। করবে না–এতদিন ধরে এখানে ডাক্তারী করছি, দু-চারটে ছেড়ে দু-চারশ দেখেছি বোধহয়। প্রথম প্রথম ওই হাত দেখে আর পা দেখে আপনার

মতই খুব দেখতে ইচ্ছে করত। মাথা ধরার ওষুধ নিতে এলেও, চোখ দেখা আর জিভ দেখার নাম করে কম দেখতাম না। এখন আর একটুও দেখতে ইচ্ছে করে না।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না, বিস্ময় লক্ষ্য করেই ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠলেন।–আরে মশাই, এটা রঙের যুগ, ভুলে যান কেন? মনে রঙ এলে বাজারের রঙ ঘরে আসতে কতক্ষণ! কত সুবিধে বলুন তো, শুধু হাত দুখানা আর পা দুখানা রঙ-পালিশ করে নিলেই হল। আর নিখুঁতভাবে করতেও পারে এরা, হাত দেখলে মনে হবে চাপার কলি, পা দেখে ভাববেন চরণকৌমুদী।

ছন্দপতন। ডাক্তার হলেই কি এমন বেরসিক হতে হয়। আমার সৌন্দর্য কল্পনার। জালটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এই জাল নিয়ে এরপর কোনো সত্যিকারের সুন্দরীকেও ঘেঁকে তোলা শক্ত।

এবারে কুঞ্জর কথা বলি। অর্থাৎ কুঞ্জলালের কথা। গৃহিণীর জন্য একখানা চিকন শাড়ি নিয়ে যাব বলে এক মস্ত দোকানে ঢুকে পড়েছি। মাঝে বিশটা বছরের ব্যবধান–লক্ষ্ণৌয়ে এসেছি, চিকন শাড়ি কিনব বলে এসেছি–তখনো কুঞ্জলালের কথা একটি বার মনেও পড়েনি। সামনের গদির বৃদ্ধটি পরম সৌজন্যে আহবান জানালেন, আইয়ে–

ভিতরের মস্ত ফরাসে বড় কাঠের ক্যাশ-বার সামনে বসে যে লোকটি, সেও সবিনয় আপ্যায়ন জানাতে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। দুজনের এই থমকানি থেকেই সংশয় দূর হয়ে গেল। কুঞ্জলাল ক্যাশ-বাক্স টপকে দুহাতে আমাকে জাপটে ধরে দু-চার ঝকানির পরেই এমন একটা কাণ্ড করে বসল, যা দেখে দোকানের কর্মচারীরা আর অন্যান্য ক্রেতারা হাঁ। আমার শরীরের ভারও নেহাত কম নয়, ফলে আমাকে নিয়ে ফরাসের উপরেই একপ্রস্থ গড়াগড়ি। পরে দম নিতে নিতে বলল, তুই একটা ইডিয়ট, তুই একটা রাবিশ, কতকাল পরে দেখলাম রে তোকে! তুই একটা জেম! পাকাঁপোক্ত লেখক বনে গেছিস একেবারে-অ্য? ..চোখ পাকাল, তোর বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলেই আমি কিনে ফেলি সে-



www.bengaliebook.com

খবর রাখিস? থাকিস কোন চুলোয়? প্রথম বই পড়ে দশ বছর আগে একটা চিঠি লিখেছিলাম –নো রিপ্লাই। উঃ, তোকে এখন খুন করতে ইচ্ছে করছে আমার

সকলের অগোচরে তার হাতের কাছ থেকে একটু সরে বসে হাসতে লাগলাম। কর্মচারীরা বা ক্রেতারা বাংলা না বুঝলেও উচ্ছ্বাস বুঝল। সামনের বৃদ্ধটি ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন আর হাসছেন মিটিমিটি। কুঞ্জলালের বাবা মানিকলাল নন, তাকে আমি কলকাতায় দেখেছি।

আজকের মত কুঞ্জলালের দোকানে বসা হয়ে গেল–আমার চিকন শাড়ি কেনাও। আমাকে নিয়ে উঠে পড়ল। বৃদ্ধটিকে বলল, কাকাজী, আমার পুরনো বন্ধু এসেছে। –একসঙ্গে দশ বছর পড়েছি আমরা–আমি এখন দোকানে থাকছি না।

তারপর কয়েকটা দিন কুঞ্জলালের সঙ্গেই বেশির ভাগ সময় কেটেছে। কুঞ্জলাল বিয়ে-থা করেছে, ছেলেপুলে আছে। না, বাঙালী মেয়ে নয়, স্বজাতিকেই বিয়ে করেছে। তার বাবা বছর তিন-চার হল মারা গেছেন। এতবড় কারবারের সে-ই মালিক এখন।

এই সাক্ষাতের ফলে আমার কলকাতায় ফেরাই দিন কতক পিছিয়ে গেল। সকালের দিকে তার আড়তে বসে কথাবার্তা গল্প-গুজব হয়। মস্ত আড়ত। চিকনের কারিগররা সব এখানেই আসে। পারিশ্রমিক নেয়, অর্ডার-পত্র নেয়। মেয়ে-পুরুষ দুই রকমের কারিগরই আছে। এর মধ্যে বর্ষীয়সী কয়েকটি রমণীর বোরখার সামনের দিকটা। ঘোমটার মত করে তোলা। অল্পবয়স্কা আপাদ-মস্তক বোরখা-ঢাকা কয়েকটি মেয়েকেও দেখলাম। কারো হাত-পা তেমনি ফুটফুটে ফর্সা। কিন্তু ডাক্তার বন্ধু আমার রূপাভিসার কল্পনার ঝোঁকটা বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। এদের হাত-পায়ের দিকে চেয়ে আমি এখন উল্টে আসল রঙ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি।

কারিগরদের কাছে কুঞ্জলাল মনিব কড়া দেখলাম। কাজ মনের মত না হলে রূঢ় কথা মুখে আটকায় না–তা সে মেয়ে হোক, বা পুরুষ হোক। তবে



www.bengaliebook.com

কাজের হাত যাদের ভালো, তাদের সে অবজ্ঞা করে বলে মনে হল না। কিন্তু অন্যেরা তটস্থ তার সামনে।

সেদিনও তার আড়তে এসে দেখি, বোরখা-পরা একটি মেয়ে বসে। আগেও দেখেছি, কিন্তু দেখার মত নয়। অর্থাৎ, হাত আর পা শ্যামবর্ণ। তবে বেশ স্বাস্থ্যবতী মনে হয়। মেয়েটি স্থির বসে আছে, আর কুঞ্জলাল তার সামনে ঝুঁকে বসে সাগ্রহে কতকগুলো অর্ডার বুঝিয়ে দিচ্ছে। রাজা-মহারাজার ঘরের অর্ডার, এর দায়দায়িত্ব এবং মুনাফা, সবই বেশি।

মেয়েটি মাঝে মাঝে সায় দিয়ে অস্‌ফুট স্বরে বলছে, জী–।

অর্থাৎ, যা তাকে বোঝানো হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে। কিন্তু ওইটুকু থেকেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভারি মিষ্টি মনে হল আমার। অর্ডারগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যেই বিনীত অভিবাদন জানিয়ে মেয়েটি শান্ত পায়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কোনো কারিগরের প্রতি কুঞ্জলালের এতটা সম্ভ্রমপূর্ণ মিষ্টি ব্যবহার আর দেখিনি। মেয়েটি চলে যাবার পরেও কুঞ্জলালকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাল যেন। একটু বাদে আমাকে বলল, এই মেয়েটি আমার কারবারের সব থেকে সেরা কারিগর, মাস গেলে কম করে পাঁচ-ছশ টাকা রোজগার করে। সী ইজ এ স্কীল আর্টিস্ট।

এত ভালোর কদর হতেই পারে। কিন্তু কুঞ্জলালের হাব-ভাব আমার কেমন যেন। লাগল–এর সবটুকুই ব্যবসায়সুলভ মনে হচ্ছে না। প্রশংসাটুকু একটু যেন আবেগ মেশান। অথচ মেয়েটি তো চোখে পড়া বা মনে ধরার মত কিছু নয়। তার ওই হাত আর পায়ের আভাসের ওপর সাদাটে গোলাপী রঙ চড়ালে বরং চোখে অন্য রকম লাগতে পারত।

কি মনে হতে কুঞ্জলাল নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। সাগ্রহে বলল, তুই তো লেখক বনে গেছিস–একটা গল্প শুনবি? এ লাইফ?



www.bengaliebook.com

আমি শঙ্কা বোধ করলাম। কুঞ্জলাল বিয়ে করেছে, ছেলেপুলের বাপ, বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে–কিন্তু য়ুনিভার্সিটির সেই রোগ এখনও আছে নাকি!

কুঞ্জলাল আমার মুখের দিকে চেয়েই মনের কথাটা বুঝল বোধহয়। বলল, তুমি যা ভাবছ বন্ধু, তা নয়–মেয়েটিকে আমি আজ পর্যন্ত চোখেও দেখিনি।

কুঞ্জলাল গল্প শুনিয়েছে। গল্পটা ভোলা সম্ভব নয়। শোনার পর মনে হয়েছে, না শুনলে লক্ষ্ণৌ আসা আমার ব্যর্থ হত।

বাপ বেঁচে থাকতেই কুঞ্জলাল কারবারের সমস্ত ভার নিজে নিয়েছিল। বাপ মানিকলাল প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। কুঞ্জলাল আর ওই কাকাজীকে কারবার দেখতে হত। কুঞ্জলালের আমলে কারবারের অনেক উন্নতিও হয়েছে। সেই সময় ওই মেয়েটি কিছুদিন হয় কাজে লেগেছে। নাম রুমাবাঈ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাতের কাজ, কথামত কাজ দিয়ে যায়–একটা দিনের জন্যেও কথার খেলাপ করে না। কুঞ্জলালের তখন কারবার ফাঁপানোর নেশা, যে ভালো কাজ করবে, যার কাজ দেখে ক্রেতা মুগ্ধ হবে, তাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে, বা দ্বিগুণ কাজ দিতে তার আপত্তি নেই। দেখতে দেখতে রুমাবাঈয়ের রোজগার সকলকে ছাড়িয়ে গেল। সব থেকে সেরা অর্ডার নেবার জন্য তারই ডাক পড়ে।

অন্যান্য কারিগররা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল ক্রমশ। তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল একটু একটু করে। একটু আধটু রটনা শোনা যেতে লাগল। ব্যাপারটা কাকাজীর চোখেও ঘোরালো ঠেকল কেমন। মেয়েটি রূপসী মনে হলে আগেই সন্দেহ হত তাঁর, আগেই উতলা হতেন। কিন্তু রটনা কানে আসতে আর স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। ভাইপোর কলকাতার কাণ্ডকারখানা ভালোই জানেন। রূপ থাক আর না থাক, কে কোথায় মজে ঠিক কি! মেয়েটির হাতের কাজ ভালো তিনিও স্বীকার করেন, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাটাই আরো বড় করে দেখলেন তিনি। শুধু কাজ ভালো হলেই এত কদর হয় না–ভালো কাজ করে এমন বয়স্ক অভিজ্ঞ কারিগরও তো আছে!



www.bengaliebook.com

ব্যাপারটা অগ্রজ, অর্থাৎ মানিকলালকে জানানো কর্তব্য বোধ করলেন তিনি। জানালেন। শুনেই মানিকলাল ত্রাসে অস্থির। ছেলের বিয়ে-থা দিয়ে তার নতুন বয়সের রোগটার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। সেইদিনই রুমাবাঈকে আড়তে ডেকে পাঠালেন। শুধু কাকাজী আছেন তার সঙ্গে, আর কেউ না।

রুমাবাঈ এল। হিসেব-পত্র করাই ছিল। মানিকলাল তার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিলেন। বললেন, তোমাকে আর প্রয়োজন নেই, আর এস না।

রুমাবাঈ স্থির পাথরের মত বসে রইল কিছুক্ষণ। মুখ না দেখা গেলেও মুখের অবস্থা অনুমান করা কঠিন নয়। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, মালিক কি আমার কাজে কোনো গাফিলতি পেয়েছেন?

মানিকলাল বললেন, না, আমার আর দরকার নেই।

নরম অথচ স্পষ্ট করে রুমাবাঈ বলল, কিন্তু আমার যে বড় দরকার মালিক। হঠাৎ এভাবে কাজ বন্ধ করে দিলে বড় অসুবিধেয় পড়ব-মালিক দয়া করে আর কটা দিন সময় দিলে

মানিকলালের মেজাজ চড়েছে। সাফ জবাব দিলেন, আর একদিনও না, অন্য জায়গায় কাজ দেখে নাও গে যাও।

কিন্তু রুমাবাঈ উঠল না। তেমনি সবিনয়ে বলল, মালিক যে কারণে আমাকে তাড়াতে চাইছেন সেটা একেবারে মিথ্যে। ছোট মালিক কাজ বোঝেন, কাজের সমঝদার তিনি, কাজ দেখে খুশী হয়েছিলেন বলে আমার নসীব ফিরেছিল। তিনি শুধু কাজই দেখেছেন, আমাকে কখনও দেখেন নি।

শোনামাত্র মাথায় রক্ত চড়েছিল মানিকলের। তিনি চেঁচিয়ে উঠেছেন, কি সত্য আর কি মিথ্যে, কে তোমার কাছে শুনতে চেয়েছে? ছোট মালিক কি দেখেছে না দেখেছে কে তোমার কাছে জানতে চেয়েছে? ছোট মালিকের নাম কে তোমাকে তুলতে বলেছে এখানে? তোমাকে আমার দরকার নেই, তুমি চলে যাও, ব্‌যস।



www.bengaliebook.com

কিন্তু রুমাবাঈ তবু গেল না। নিশ্চল মূর্তির মত আরো খানিকক্ষণ বসেই রইল। তারপর তেমনি নম্র অথচ দ্বিধাশূন্য স্পষ্ট গলায় বলল, মালিক কেন আমাকে তাড়াচ্ছেন, আমি তা জানি। ওদের হিংসা আমিও দেখছি। রটনা যে একটুও সত্যি নয়, আমি যদি তার প্রমাণ দিতে পারি, তাহলেও কি মালিক আমাকে রাখতে আপত্তি করবেন?

ওই কথা কটি, কণ্ঠস্বর, আর আচরণের মধ্যেও কিছু বোধহয় ছিল। কাকাজী বোবার মত দাঁড়িয়ে। আর মানিকলালও কৌতূহলে থমকালেন ঈষৎ।

–কি প্রমাণ দেবে?

প্রমাণ রুমাবাঈ মুখে কিছু দিল না। আস্তে আস্তে ঘন কালো বোরখাটা খুলে। ফেলল শুধু। খুলে সেটা সরিয়ে রাখল। তারপর মানিকলের দিকে দুচোখ মেলে তাকাল শুধু।

এতবড় বিস্ময় কাকাজী আর মানিকলের জীবনে এই প্রথম।

কাকে দেখছেন তারা কিছুই বুঝছেন না। রূপসাধক কোনো শিল্পীর আঁকা যেন–নাক-মুখ-চোখ–সমস্ত নারী-অঙ্গ। জ্যোৎস্নাঘোয়া ধপধপে গায়ের রঙ। শুধু হাতের খানিকটা আর পায়ের খানিকটা কালো রঙ করা–বোরখা পরা থাকলে যতটুকুর আভাস পাওয়া সম্ভব ততটুকু।

মানিকলাল আর কাকাজীর চোখে পলক পড়ে না, মুখে কথা সরে না।

রুমাবাঈ তেমনি শান্ত মুখে বলে গেল, যে সন্দেহ করে মালিক আমাকে তাড়াতে চাইছেন, তা সত্যি হলে টাকার জন্যে এ-পথে আসার দরকার হত না বোধহয়–মেহনতী কাজ করতে হত না। তা চাই না বলে হাতে-পায়ে কালো রঙ মেখে সকলের চোখ থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে সম্মানের উপার্জনে লেগেছি।

দু-চার কথায় এরপর পিতৃসদৃশ মানিকলাল আর কাকাজীর কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলেছে সে। এই রূপই তার জীবনের সবথেকে বড়

অভিশাপ, দুষ্ট লোকে তার নামে কলঙ্ক দিয়ে তার স্বামী কেড়ে নিয়েছে–একটি ছেলে নিয়ে তাকে পথে দাঁড়াতে হয়েছে। সেই ছেলেটিই এখন প্রাণ তার। তাকে সে মানুষ করছে, ভালো জায়গায় রেখে পড়াচ্ছে। তাকে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করলে সেই ছেলে বড় হবে কি করে, মানুষ হবে কি করে? মালিক যেন দয়া করে কাজ থেকে না ছাড়ান তাকে, ছোট মালিক কোনোদিন তার মুখ দেখেন নি, কোনোদিন দেখবেনও না।

কাকাজীর কাছে কুঞ্জলাল এ-সব শুনেছে বাবার মৃত্যুরও অনেক পরে। শুনেছিল, কারণ কুঞ্জলালই একবার তাকে কাজ থেকে জবাব দেবে স্থির করেছিল। যে মেয়ের কাজে কখনো কোনো ত্রুটি দেখেনি, তারই কাজে পর পর অনেকদিন গাফিলতি দেখেছে। সময়ে কাজ নেয়নি, সময়ে কাজ দেয়নি, যাও দিয়েছে তাও মনোমত হয় নি। কুঞ্জলাল ভেবেছিল, রোজগারের দেমাকে এই অধঃপতন। তার ওপর একটা বড় কাজের জন্য দু তিনবার তার কাছে কর্মচারী পাঠাতে সে বলে পাঠিয়েছিল, এখন অসুবিধের মধ্যে আছে ভারি কাজ নেওয়া এ সময়ে তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কুঞ্জলাল তেতে ছিল, এইবার আগুন হয়ে উঠল। তাছাড়া মেয়েটার চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করার লোকও সর্বদাই আছে। কর্মচারীদের অনেকেই ঠাট্টা করেছে, নাগর। জুটেছে বোধহয়, এখন ভারি কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করবে কেমন করে!

কুঞ্জলাল মেয়েটিকে জবাব দেবে স্থির করেছে শুনে কাকাজী তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, তার ছেলের খুব অসুখ–আমাকে সে জানিয়েছে।

কুঞ্জলাল সে-কথা কানে তোলেনি। আবার ছেলেও আছে শুনে মনে মনে উল্টে সে অশ্লীল কটুক্তি করেছে। ছেলে থাকলেও সুস্থ সামাজিক সন্তান ভাবেনি। আর ছেলের অসুখ, তাও বিশ্বাস করেনি। সে ব্যবসায়ী, ব্যবসা সব কিছুইর আগে অসুখের বিন্যাস শোনার আগ্রহ তার নেই।

এরপর রুমাবাঈ আবার একদিন কাজের জন্য আসতে সে জবাব পাঠাতে যাচ্ছিল, কাজ নেই। কিন্তু কাকাজী আবার বাধা দিয়েছেন। তাকে আড়ালে

টেনে নিয়ে গিয়ে সেই একদিনের ঘটনা বলেছেন। শুনে কুঞ্জলাল কতক্ষণ স্থাণুর মত বসেছিল, ঠিক নেই। ইতিমধ্যে কাকাজী রুমাবাঈকে পরদিন আড়তে এসে মালিকের সঙ্গে দেখা করে কাজ নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন।

রুমাবাঈ এসেছিল। কুঞ্জলাল প্রথমেই ছেলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছে। জবাব দেবার আগে রুমাবাঈ চুপ করে বসেছিল খানিক। ছেলের অসুখের খবরটা সে একমাত্র কাকাজীকেই গোপনে দিয়েছিল। অস্ফুট শান্ত জবাব দিয়েছে, মালিকের আশীর্বাদে ভালো আছে।

কুঞ্জলাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। চুপচাপ চেয়ে চেয়ে সেই কালো। বোরখা আর কালো হাত-পা দেখেছিল। তারপর নিঃশব্দে কাজ এগিয়ে দিয়েছে।

রুমাবাঈয়ের এই কালো বোরখা যেন স্পষ্ট নিষেধ। কিন্তু নিষেধ মানতে চায়নি কুঞ্জলাল। একদিন ওই বোরখা সরাবার জন্য অনুনয় করেছিল। কাকাজীর কাছে সব শুনেছে জানিয়ে একটিবার মাত্র তাকে দেখতে চেয়েছিল।

কিন্তু ঘন-কালো বোরখার আড়ালে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতই বুঝি বসেছিল রুমাবাঈ। তারপর খুব নরম করে আস্তে আস্তে বলেছে, কথা দিয়ে সে কখনো কথার খেলাপ করেনি–বড় মালিককে সে কথা দিয়েছিল। ছোট মালিককে সে শ্রদ্ধা করে, তিনি যদি চান সে বোরখা সরাবে...কিন্তু তাহলে আর তার কোনোদিন এখানে কাজ নিতে আসা হবে না।

কুঞ্জলাল তা চায় নি।

## মা

বাবা মা ভাই বোন ভাইয়ের স্ত্রী ভগ্নিপতি–সব মিলিয়ে একঘর লোকের সামনে স্ত্রীর এই বেখাপ্পা আচরণ দেখে গৌরীনাথবাবু আধা বিস্মিত আধা ক্রুদ্ধ। তার দুশ্চিন্তা আর দ্বিধার জবাবে স্ত্রী সুপ্রীতি উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার তলা থেকে চাবির গোছা বার করে দেয়াল-ঘেঁষা গডরেজের আলমারিটা



www.bengaliebook.com

খুলে ফেললেন। তারপর অন্য চাবি দিয়ে ভিতরের লকারটা। লকার থেকে বড় বড় দুটো গয়নার বাক্স বার করে গৌরীনাথবাবুর সামনে রাখলেন। ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, হাতে টাকা না থাকে তো এগুলো দিয়ে ব্যবস্থা করো–ছেলে ফিরে না পেলে কিসের টাকা কিসের গয়না

ঘরে আর যারা ছিল তারা চুপ। গৌরীনাথবাবুর চোখেমুখে ভর্ৎসনা মেশানো। বিস্ময়। সুপ্রীতি দেবীর আত্মস্থ হবার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। আবেগের মুখে কাজটা যে ভালো করা হল না সেটা তক্ষুনি মনে ডাক দিল। কারণ সর্ব ব্যাপারে স্বামীর মুখাপেক্ষী তিনি। নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর নির্ভর করে কোনো গুরু দায়িত্বের কাজই ঠিক মতো করে উঠতে পারেন না। গলার সুর নরম করে তক্ষনি ভুলটা শুধরে নিতে চেষ্টা করে বললেন, সর্বদা অত টাকা কারই বা হাতে থাকে, কাজ চালিয়ে নাও পরে না-হয় এর ডবল বানিয়ে দেবে।

কথাটা উঠেছিল ছেলের বিশেষ একটা দৈব আনুকূল্য লাভের প্রবল সম্ভাবনার প্রসঙ্গে। বারো বছরের একমাত্র ছেলে দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত। এখন একেবারে উত্থানশক্তিরহিত পঙ্গু। ভবিষ্যতের অবধারিত চিত্র আরো ভয়াবহ অন্ধকার। পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসাই ব্যর্থ। তারপর ভারতের বহু তীর্থে বহু দৈব-প্রচেষ্টা, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ আর দামী-দামী স্টোন ধারণের ফাঁক দিয়েও কত হাজার টাকা জলের মতো বেরিয়ে গেছে, হিসেব নেই। এখন শুধু হতাশা আর হতাশা।

এই সময় এক মহাসাধকের নাম প্রায়ই কানে আসতে লাগল তাদের। কলকাতার দোকানে দোকানে তার ছবি দেখা যেতে লাগল। আর বহু নাম-করা কাগজেও ভগবান-সদৃশ ওই মহাযোগীর এমন সব করুণা-লীলার কাহিনী প্রচার লাভ করল যে পড়লে শুচিশুভ্র আবেগে চোখে জল আসে।

গৌরীনাথবাবু খুব একটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু মন দুর্বল। স্ত্রীর মন ততোধিক দুর্বল। ফলে ওই করুণাময় সম্পর্কে দিশি আর বিদেশী লেখকের বই সংগ্রহ করে দুজনেই পড়তে লাগলেন। সেইসব বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী এবং তত্ত্ববিশ্লেষণ অভিভূত হবার মতোই বটে। এ ছাড়া বহু

শুভার্থীজনও তাদের। পরামর্শ দিলেন, একবার কপাল ঠুকে চলে যান ছেলেকে নিয়ে, যদি দর্শন মেলে আর দয়া মেলে তাহলে অলৌকিক কিছু হতেও পারে, এমনিতে তো আর কোন আশা নেই।

কিন্তু চলে যান বললেই এই ছেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায় না। অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন ওই মহাতপা যেখানে থাকেন ছেলের বর্তমান অবস্থায় সেদিকে পা বাড়ানোটা দুর্গমযাত্রার সামিল। বইয়ে সে-পথের বিবরণ শুনে সুপ্রীতি দেবী পর্যন্ত। দমে যান। ফলে, মনে মনে প্রায় অলৌকিক গোছের একটা আশা নিয়ে বসে ছিলেন। তিনি। খোঁজ-খবর করে এই কলকাতায়ও ওই দেব-মানবের অনেক গণ্যমান্য ভক্তের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। শুনেছেন বাবাকে একবার তারা এই কলকাতায় নিয়ে আসতে চেষ্টা করছেন। তবে এও শুনেছেন, বাবার ইচ্ছে না হলে শত চেষ্টাতেও তা হবে না।

গৌরীনাথবাবু স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন, ইচ্ছে হবেই একদিন। ভক্ত টানলে ভগবানেরও টনক নড়ে। স্বামীর ওপর আর তার কথার ওপর স্ত্রীটির অগাধ আস্থা। কিন্তু আরো প্রায় দেড়টা বছর কেটে যেতে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ছেলের অবস্থা ধীর কিন্তু অবধারিত গতিতেই সঙ্কটের দিকে গড়াচ্ছে।

এমন দিনে একটা সংবাদ শুনে সুপ্রীতি দেবী আশায় আনন্দে কন্টকিত।ঐশ্বরিক ক্ষমতার ওই মহাযোগী দিল্লীতে আসছেন। সেখানকার ভক্তরা তার সম্মতি পেয়ে বিপুল আয়োজন করেছেন। পাকা খবর। দিন তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট। কলকাতার বহু ভক্ত দিল্লীর দিকে ছুটেছেন।

দিল্লী! সুপ্রীতি দেবীর মনে হল দিল্লী একেবারে হাতের মুঠোয়। এরোপ্লেনে দুঘণ্টার পথ। পা ফেলার পর আর কোনো ঝামেলা নেই, সেখানে দেওরের বাড়ি দেওরের গাড়ি। ঠাকুর মুখ তুলে না চাইলে এমন সুযোগ আসে!

শোনার পর মন দুর্বল গৌরীনাথবাবুরও। কিন্তু তাকে সাত-পাঁচ ভেবে দেখতে হবে। অন্ধ অবাস্তব আশার পিছনে ছুটে এযাবত বহু হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কম করে পঞ্চাশ ষাট হাজার তার ওপর এক-একটা চেষ্টা

বিফল হবার পর সে কি হতাশা–বিশেষ করে স্ত্রীর। ভেঙে পড়ার দাখিল একেবারে।

অতএব সবদিক ভেবে দেখারই আলোচনায় বসা হয়েছিল সকলে মিলে। কিন্তু দ্বিধার প্রথম পর্যায়েই সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে বসলেন, আসল কথা, বাবার সঙ্গে দেখা হলে আর তার করুণা পেলে ছেলে ভালো হয়ে যাবে, এ তুমি বিশ্বাস করো কি করো না?

গৌরীনাথবাবুর বিব্রত মুখ। বইপত্র যা পড়েছেন, মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেই মন চায়। দ্বিধান্বিত জবাব দিলেন, করুণা পাবই এমন ভরসা কোথায়?

স্ত্রী স্থির প্রত্যয়ে জবাব দিলেন, দেখা পেলে করুণাও পাব।

–সেভাবে দেখা মিলবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সুপ্রীতি আধা বিস্মিত আধা বিরক্ত।কি যে বলো ঠিক নেই, দিল্লীর মতো জায়গায় তুমি নিজে চেষ্টা করলে দেখা হবে না এ আবার একটা কথা নাকি! তাছাড়া এখান থেকে চেনা-জানা ভক্ত যাঁরা যাচ্ছেন তারাও সাহায্য করবেন। তারও দরকার হবে না, তুমি চেষ্টা করলেই হবে–

মনে মনে বিরক্ত একটু গৌরীনাথবাবুও। স্ত্রীর ধারণা, তার স্বামী নাম লেখক। আর কাগজের বড় চাকুরে অতএব দুনিয়ার সমস্ত দরজাই তার কাছে খোলা। বললেন, হ্যাঁ, আমি দিল্লীর লাটসাহেব একেবারে। যাক, এরপর খরচের দিকটাও চিন্তা করার আছে, ওই ছেলেকে নিয়ে যেতে হলে তুমি আমি ছাড়াও আর একজন লোক অন্তত দরকার–এরোপ্লেনে চারজনের যাতায়াত ছাড়াও অন্য খরচা আছে, কম করে চার হাজার টাকা লাগবে।

জবাবে চিরসহিষ্ণু আর চিরমুখাপেক্ষী স্ত্রীর ওই কাণ্ড। সকলের সামনে আলমারি থেকে গয়নার বাক্স বার করে ওই উক্তি।

.



www.bengaliebook.com

বিস্ময় কাটতে দুচোখের নীরব ভর্ৎসনাটুকুই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। পরে স্ত্রীর নরম সুরের জবাবদিহিতেও কাজ হল না তেমন। কিন্তু বাইরের আচরণে বরাবর সংযত মানুষ গৌরীনাথবাবু। মৃদু গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, ও-দুটো জায়গা-মত রাখো

উঠলেন। খোলা আলমারি থেকে চেক-বই বার করলেন। পকেট থেকে কলম টেনে নিয়ে সামনের ছোট টেবিলটায় বসলেন। খসখস করে চার হাজার টাকার চেক লিখে নাম সই করে চেকটা ছিঁড়ে ছোট ভাইয়ের হাতে দিলেন।–কাল ফার্স্ট আওয়ারে চার হাজার টাকা তুলে এয়ারে চার জনের সীট বুক করবি, টিকিট থাক বা না থাক আমার সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বন্ধুর কাছে গেলেই সে ব্যবস্থা করে দেবে। টিকিট হাতে পেলেই দিল্লীতে দীপুকে একটা আরজেন্ট টেলিগ্রাম করে দিবি। তারপর ছেলে আর তোর বউদিকে নিয়ে সন্ধ্যার ফ্লাইটে তুই আর দিবা দিল্লী যাবি–সাধ যখন হয়েছে টাকার জন্যে আটকাবে না।

সুপ্রীতি দেবীর শুকনো মুখ, বা রে, তুমি না গেলে কি করে হবে!

–আমার কথা-বার্তা যখন পছন্দ হচ্ছে না, নিজেই চেষ্টা করে দেখো।

গম্ভীর মুখে ঘর ছেড়ে ছেলের কাছে চলে গেলেন গৌরীনাথবাবু। ছেলে বারান্দায় হুইলচেয়ারে বসে।

রাতে মানভঞ্জনের পালা। রাগত মুখেই সুপ্রীতি দেবী বললেন, নিজের ওপর ভরসা করে কবে আমি কোন কাজ করি বা কোন কথা বলি তুমি জানো না?

বলতে না বলতে চোখে জল। একমাত্র এই বস্তুটিকেই গৌরীনাথবাবু মনে মনে ভয় করেন। ফলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপোস।

না, স্ত্রী আদৌ অতিশয়োক্তি করেননি। সর্ব ব্যাপারে সর্ব কাজে উনি স্বভাবগত কারণেই স্বামীর ওপর একান্ত নির্ভরশীলা। ঠিক এই জন্যে গৌরীনাথবাবুর কখনো খেদ কখনো অন্তর্ভুষ্টি। স্বামীর মতামত না পেলে কোনো একটা জরুরী ব্যাপারও স্ত্রীটি ফয়সালা করে উঠতে পারেন না।



www.bengaliebook.com

ভদ্রলোকের একবার শক্ত অসুখ হয়ে পড়তে একটা দুশ্চিন্তায় তার দুচোখে জল দেখা দিত।...তার অবর্তমানে হাজার টাকা পয়সা থাকলেও ওই স্ত্রীর অসহায় অবস্থাটা তিনি যেন দেখতে পেতেন। পরে কত সময় ধমকেছেন, একে একে নিজে সব দেখে শুনে বুঝে নাও,কখন কি দরকার হয় ঠিক আছে। কিন্তু তার তাগিদে দেখে-শুনে বুঝে নিতে গিয়ে স্ত্রীর হিমসিম অবস্থা। শেষে গৌরীনাথবাবু নিজেই হাল ছেড়ে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

ছেলে স্ত্রী আর একটি ভাই নিয়ে গৌরীনাথবাবু দিল্লী উড়ে এসেছেন। কিন্তু তারপরেই যেন হাবুডুবু অবস্থা সকলের।

মহাযোগী বাবাকে নিয়ে দিল্লীতে এক এলাহি ব্যাপার। বিরাট পার্ক-এ তাবু ফেলে সাজিয়ে গুছিয়ে পঞ্চাশ হাজারের মতো জন-সমাবেশের ব্যবস্থা। কিন্তু আরো বিশ তিরিশ হাজারের বেশি ব্যবস্থা হলেও যথেষ্ট নয়। লোকে লোকারণ্য। সমস্ত দিল্লীবাসী বোধহয় ওই একপথে ভেঙে পড়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে কত রোগী এসেছে। ঠিক নেই। বাবার অবস্থানের দুমাইলের মধ্যে মোটর গাড়ি পার্ক করার পর্যন্ত জায়গা। মেলে না।...প্যাণ্ডেলে সকাল-সন্ধ্যার কীর্তনের আসরে বাবা একঘণ্টা দেড় ঘণ্টার জন্যে আসেন, ঘুরে ঘুরে সকলের উদ্দেশে আশীর্বাদ করেন হাত তুলে, ওই বিভোর তন্ময় মূর্তি দেখলেই মনে হয় এ-জগতের কেউ নন। রোগীদের মধ্যেও ঘোরাঘুরি করেন, হঠাৎ হঠাৎ কাউকে বিভূতিও দেন, কারো মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু গড় হিসেবে সে-রকম ভাগ্য দুশর মধ্যে একজনেরও হয় কিনা সন্দেহ। বহু ক্লেশে গৌরীনাথবাবু দুবেলাই সপরিবারে বাবার দর্শন পাচ্ছেন–কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা বা কৃপা লাভ করা দুরাশাই বোধহয়। অথচ এই মুহূর্তে গৌরীনাথবাবুরও বদ্ধ বিশ্বাস, কৃপা পেলে উদ্দেশ্য সফল হবেই, অলৌকিক উপায়ে ছেলে ভালো হবেই।

কিন্তু সেই একান্ত সন্নিধানে কি করে যাবেন? পার্কসংলগ্ন যে বিশাল প্রাসাদে তিনি অবস্থান করছেন, তার চতুর্দিকেও জনসমুদ্র। দুর্ভেদ্য পুলিশ প্রহরায় আর ভলান্টিয়ারদের তৎপরতায় বাড়ির গেটের বিশ গজের মধ্যেও কারো যাবার উপায় নেই। অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা করে অনেকেই ভিতরে যাচ্ছেন,

বাবার অনুগ্রহ পাচ্ছেন, কিন্তু সেই বিশেষ ব্যবস্থা গৌরীনাথবাবুর অন্তত করায়ত্ত নয়। কলকাতার ভক্তদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে, কিন্তু অবস্থা এমন যে তারা নিজেরাই বাবার ধারে কাছে যেতে পারছেন না। এখানে কে কাকে চেনে?

নিরুপায়, সুপ্রীতি দেবী রাতে চোখের জলে বালিশ ভেজান আর প্রার্থনা করেন, বাবা, তুমিই ব্যবস্থা করো, পথ দেখাও।

বাবা দিল্লীতে অবস্থান করবেন সাতদিন। তার মধ্যে চার-চারটে দিন চলে গেছে। গৌরীনাথবাবু মরীয়া হয়ে উঠেছেন। তাদের কাগজের এখানকার শাখা-অফিসের মারফৎ সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হতে চলেছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ আশার আলো এক টুকরো। অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ একজনের সঙ্গে। অবাঙালী। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী ছিলেন একসময় রাজধানীর। অধ্যাত্মবিদ হিসেবে সুপরিচিত তিনি। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাধু-সন্তদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ তার। তিনি রাজধানীতেই আছেন এবং গৌরীনাথবাবুর কাছে তিনি একেবারে দুর্লভ নন।

ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে তার কাছেই ধরনা দিয়ে পড়লেন গৌরীনাথবাবু। খবর পেয়েছেন, বাবার সঙ্গে ভদ্রলোকের এই দিনই বিকেলে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়ে আছে।

ছেলেকে দেখে সহৃদয় ভদ্রলোকটির মন বিচলিত হল। বললেন, আচ্ছা বিকেল ঠিক চারটের সময় ছেলেকে সঙ্গে করে আমার সঙ্গেই চলো, আমি বাবাকে ধরে। পড়ব, আশাকরি ব্যবস্থা হবে।

কৃতজ্ঞতায় গৌরীনাথবাবু নির্বাক খানিক। এমন আশ্বাসের কথা দিল্লীতে এসে এই প্রথম শুনলেন। ফেরার পথে স্ত্রীর দুই চোখও ছলছল। মাঝে মাঝে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেন। নীরব উচ্ছ্বাসের একটাই অর্থ যেন, তুমি চেষ্টা করলে হবে না এমন কিছু আছে নাকি!

.



www.bengaliebook.com

ঘড়ি-ধরা সময়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে সেই ঈপ্সিত প্রাসাদের কাছাকাছি উপস্থিত হলেন সকলে। ভিড় তখন অপেক্ষাকৃত কম হলেও গাড়ি এগোবার উপায় নেই। খানিকটা তফাতেই নামতে হল। পিছনের ক্যারিয়ার থেকে তাড়াতাড়ি ফোলডিং হুইল চেয়ার বার করে ছেলেকে বসালেন। স্ত্রীও তৎপর হাতে সাহায্য করলেন তাকে। তারপর এগিয়ে চললেন।

সামনে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী। পিছনে হুইলচেয়ার ঠেলে নিয়ে চলেছেন গৌরীনাথবাবু, পাশে স্ত্রী। ওঁদের দুজনেরই দুরু দুরু বক্ষ।

সামনের ভিড়ের অবরোধ সহজেই দুভাগ হয়ে গেল। এ সময়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে কে আসছেন ব্যবস্থাপকরা সকলেই জানে।

এবারে সামনে গেট। গেটের ওধারে সারি সারি ভলান্টিয়ার মোতায়েন। ছাড়পত্র না পেলে তারা একজনকেও ঢুকতে দেবে না। গেটের ও-ধারে লম্বা রাস্তার শেষে বাড়ি। সেখানেও বেশ জনাকতক ভাগ্যবান আর ভাগ্যবতীর সমাবেশ। ছাড়পত্র পেয়ে তারা কেউ বাড়ির মধ্যে ঢুকছে, কেউ বা ঢোকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

একজন ব্যবস্থাপক ভলান্টিয়ারদের কানে কানে কি বলতে বদ্ধ গেট একটুখানি খুলে প্রাক্তন মন্ত্রীকে ভিতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হল। গৌরীনাথবাবু বা স্ত্রী বা হুইলচেয়ারে আসীন ছেলের ছাড়পত্র নেই। গেট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

গেটের ওদিক থেকে সদাশয় প্রাক্তন মন্ত্রীটি গলা খাটো করে গৌরীনাথবাবুকে বললেন, এখানেই অপেক্ষা করো, আমি দেখি কি করতে পারি।

আবার অধীর প্রতীক্ষা। ভলান্টিয়াররা নিছক দয়া করেই বোধহয় তাঁদের তফাতে হটিয়ে দিল না। কিংবা হয়তো বুঝে নিল এরাও ফেলনা লোক নয়।

মিনিট দশেকের মধ্যে একজন ভলান্টিয়ার ভিতর থেকে ছুটে এলো।



www.bengaliebook.com

গেটের সামনে এসে হুইলচেয়ারে বসা ছেলেকে দেখিয়ে বলল, একে ভিতরে নিয়ে আসুন, জলদি।

হুইলচেয়ার নিয়ে বদ্ধ গেট ঠেলেই তারা ভিতরে ঢোকার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাধা আবার।–ও নো নো! ওনলি ওয়ান। ছুটে-আসা ভলান্টিয়ারের ব্যস্ত-সমস্ত নির্দেশ।–রোগীর সঙ্গে আপনাদের যে-কোনো একজন আসুন, দুজন আসার নিয়ম নেই।

গৌরীনাথবাবু বিমূঢ় কয়েক মুহূর্তের জন্য। গেট আধখানা খোলা হয়েছে। জোর করে, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে হুইলচেয়ার ঠেলে ভিতরে ঢুকতে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণে কাঁধের কাছে বেশ জোরেই একটা ঠেলা খেয়ে প্রায় নিজের অগোচরে একটু সরে গেলেন। তাজ্জব বিস্ময়ে দেখলেন স্ত্রী তাকে ঠেলে হুইলচেয়ারের দখল নিয়ে বলছেন, সরো সরো, তুমি পারবে না, আমি যাচ্ছি–

বাধা দেবারও অবকাশ পেলেন না গৌরীনাথবাবু। ছেলেসহ হুইলচেয়ার ঠেলে স্ত্রী গেটের ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। চিৎকার করে বলতে গেলেন, তুমি তো রোগের নামটাও ঠিকমতো বলতে পারবে না

বলা হল না। হতভম্ব বিস্ময়ে দুচোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন তিনি। হুইলচেয়ার ঠেলে স্ত্রী তরতর করে যেন এক লক্ষ্যকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলেছেন। স্ত্রীর এমন আত্মস্থ সমাহিত অথচ তৎপর মূর্তি আর বুঝি দেখেননি। নিষ্পলক চেয়েই আছেন গৌরীনাথবাবু। আর সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছেন, ঠিক এই মুহূর্তে বাপের। তুলনায় ছেলের মায়ের সঙ্গে যাওয়াটার কত তফাৎ।

রাত আর দিনের মতই তফাত।



www.bengaliebook.com